# S@ifur's BCS

## ৩৬তম লিখিত

- প্রাচীন জনপদ
- নদী-প্রণালী
- জলবায়ু
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিবরণ

- বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফি
- জনসংখ্যার সোনালী ধাপ বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট
- সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি
- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদী
- মানব সম্পদ
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধাণের উপায়
- উপজাতীয় সংস্কৃতি

মোঃ মাহফুজুর রহমান
SMS : 01613 43 20 65

# বাংলাদেশ বিষয়াবলি

০১

BCS নিয়ে যে কোন পরামর্শ ও
অভিনন্দন দিয়ে Comment/Like করুন-
www.facebook.com/groups/saifurs.bcs.achievement

Scanned by CamScanner

# BCS Syllabus on Bangladesh Affairs

This paper is designed to cover various issues/topics concerning Bangladesh affairs which include history, geography, environment, society, culture, economy and politics.
The topics/areas that should be covered are stated below:

01. Geography of Bangladesh that should include topographical features of different areas/regions and their developments over time.

02. Demographic features including ethnic and cultural diversity.

03. History and culture of Bangladesh from ancient to recent times.

04. Economy, society, literature and culture of Bangladesh with particular emphasis on developments including Poverty Alleviation, Vision- 2021, GNP, NNP, GDP etc. after the emergence of the country.

05. Bangladesh's environment and nature and challenges and prospects with particular emphasis on conservation, preservation and sustainability.

06. Natural resources of Bangladesh with focus on their sustainable harnessing and management.

07. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh: Preamble, Features, Directive Principles of State Policy, Constitutional Amendments.

08. Organs of the Government:
    a) Legislature: Representation, Law-making, Financial and Oversight functions; Rules of Procedure, Gender Issues, Caucuses, Parliament Secretariat.

    b) Executive: Chief and Real executive e.g., President and Prime Minister, Powers and Functions; Cabinet, Council of Ministers, Rules of Business, Bureaucracy, Secretariat, Law enforcing agencies; Administrative setup- National and Local Government structures, Decentralization Programmes and Local Level Planning.

    c) Judiciary: Structure: Supreme, High and other Subordinate Courts, Organization, Powers and functions of the Supreme Court, Appointment, Tenure and Removal of Judges, Organization of Sub-ordinate Courts, Separation of Judiciary from the Executive, Judicial Review, Adjudication, Gram Adalat, Alternative Dispute Resolution (ADR).

09. Foreign Policy and External Relations of Bangladesh:
Goals, Determinants and policy formulation process; Factors of National Power; Security Strategies; Geo-Politics and Environment Issues; Economic Diplomacy; Man-power exploitation, Participation in International Organizations; UNO and UN Peace Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc, and International Economic Institutions, Foreign Aid, International Trade.



Scanned by CamScanner

10. Political Parties: Historical development; Leadership; Social Bases; Structure; Ideology and Programmes; Factionalism; Politics of Alliances; Inter and Intra-Party Relations; Electoral Behaviour; Parties in Government and Opposition.

11. Elections in Bangladesh. Management of Electoral Politics: Role of the Election Commission; Electoral Law; Campaigns; Representation of People's Order (RPO); Election Observation Teams.

12. Contemporary Communication; ICT, Role of Media; Right to Information (RTI), and E-Governance.

13. Non-formal Institutions; Role of Civil Society; Interest Groups; and NGOs in Bangladesh.

14. Globalization and Bangladesh: Economic and Political Dimensions; Roles of the WTO, World Bank, IMF, ADB, IDB and other development partners and Multi National Corporations (MNCs).

15. Gender issues and Development in Bangladesh.

16. The Liberation War and its Background: Language Movement 1952, 1954 Election, Six-Point Movement, 1966, Mass Upsurge 1968-69, General Elections 1970, Non-cooperation Movement, 1971, Bangabandhu's Historic Speech of 7th March. Formation and Functions of Mujibnagar government, Role of Major Powers and of the UN, Surrender of Pakistani Army, Bangabandhu's return to liberated Bangladesh. Withdrawal of Indian armed forces from Bangladesh.

## ৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা -২০১৫

সরল

বিষয় কোড ঃ ০০৫

নির্ধারিত সময়- ৪ ঘন্টা

পূর্ণমান- ২০০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১। (ক) প্রাচীন বাংলার রাঢ় জনপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ৫

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী? ৫

(গ) আওয়ামী লীগের ৬-দফা কি কি? ৫

(ঘ) ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূল তাৎপর্য কী? ৫

২। (ক) দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। ৫

(খ) বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কী? ৫

(গ) বাংলাদেশের বনজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ৫

(ঘ) তিস্তার পানি সংকটের পরিবেশগত প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৫

৩। (ক) বাংলাদেশের গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিক মোট দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি'র বিবরণ দিন। ৫

(খ) রেমিটেন্স খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী অবদান রাখছে? ৫

(গ) বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরুন। ৫



Scanned by CamScanner

(ঘ) সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত ধারনা দিন। ৫

৪। (ক) বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় দ্বারা আপনি কী বুঝেন? ৫

(খ) আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের নদী দূষণের প্রধান কারণগুলো কি কি? ৫

(গ) বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি চিত্র তুলে ধরুন। ৫

(ঘ) ভবিষ্যতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে? ৫

৫। (ক) বাংলাদেশ সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ১২ ধারাটি লিখুন। ৫

(খ) বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ ধারায় আপনি কী ধরনের সংস্কার প্রস্তাব করবেন? ৫

(গ) বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পাঁচটি দিক উল্লেখ করুন। ৫

(ঘ) সংসদীয় সরকার কিভাবে গঠিত হয়? ৫

৬। (ক) বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কিভাবে গঠিত হয়? এর প্রধান কাজ কি কি ? ৫

(খ) এটর্নি জেনারেলের কাজ কি কি ? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৫

(গ) বাংলাদেশে ন্যায়পালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৫

(ঘ) ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের আইনে একজন সাংসদের জন্য নির্বাচনী ব্যয়ের একটি ধরাবাহিক পরিবর্তন চিত্র তুলে ধরুন। ৫

৭। (ক) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতার একটি বিবরণ দিন। ৫

(খ) বাংলাদেশের আইন পরিষদের গঠন সম্পর্কে লিখুন। ৫

(গ) বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় Rules of Procedure-এর গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখুন। ৫

(ঘ) বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের গঠন সম্পর্কে লিখুন। ৫

৮। (ক) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কি কি? ৫

(খ) 'জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল নির্ধারক'– ব্যাখ্যা করুন। ৫

(গ) অর্থনৈতিক দিক থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরুন। ৫

(ঘ) BCIM দ্বারা কী বুঝায়? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এর প্রধান তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। ৫

৯। (ক) বাংলাদেশে কোন ধরনের দল ব্যবস্থা রয়েছে? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। ৫

(খ) ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। ৫

(গ) বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন। ৫

(ঘ) ১৯৯১ সাল পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? ৫

১০। টীকা লিখুন (যে কোন চারটি) ঃ ৫ × ৪ = ২০

(ক) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার ও বাংলাদেশ;

(খ) বাংলাদেশ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা;

(গ) বিশ্ব ক্রিকেট ও বাংলাদেশ;

(ঘ) সরকারি চাকুরীতে কোটা;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারিত্ব;

(চ) ই-গভর্নেন্স ও বাংলাদেশ;

(ছ) বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয়;

(জ) বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ।



Scanned by CamScanner

Teacher Work

## প্রাচীন জনপদ

প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলার বিশেষ কোনো নাম ছিল না। তখন বাংলাদেশ নামক কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বও ছিল না। সমগ্র বাংলা জুড়ে ছিল অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং সেগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বাংলার পুণ্ড ও বরেন্দ্র; পশ্চিম বাংলায় রাঢ়, তাম্রলিপ্ত; উত্তর-পশ্চিম বাংলার কিছু অঞ্চল নিয়ে গৌড়; দক্ষিণ এবং পূর্ব বাংলায় সমতট, হরিকেল, বাঙ্গাল বা বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল। এসব দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং এগুলো জনপদ নামে পরিচিত ছিল। তবে এসব জনপদের সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন জনপদগুলোর সীমা ও ব্যাপ্তি পরিবর্তিত হতো।

**বাংলার প্রাচীন জনপদ এবং নগরসমূহ :**

বিভিন্ন উৎস থেকে এ পর্যন্ত বাংলার প্রায় ষোলটি প্রাচীন জনপদ এবং বহু নগরের সন্ধান মিলেছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জনপদ ও নগরের বিবরণ প্রদান করা হলো :

- **গৌড় :** গৌড় প্রাচীন বাংলার একটি সুপরিচিত জনপদ হলেও এর অবস্থান নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি। পাণিনির গ্রন্থ, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' থেকে প্রাচীন গৌড় রাজ্য ও তার সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। হর্ষবর্ধনের অনুশাসন লিপি থেকে জানা যায় যে, মৌখরীরাজ ঈশানবর্মণ গৌড়বাসীকে পরাজিত করে সমুদ্র পর্যন্ত বিতাড়িত করেছিলেন। এ থেকে ধারণা করা হয়, গৌড় দেশ সমুদ্র উপকূল থেকে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না। রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম অমোঘবর্ষের অনুশাসন লিপিতে মুর্শিদাবাদের একটি অঞ্চল হিসেবে গৌড়-বিষয় (জেলা) নামের উল্লেখ আছে। সম্ভবত এ বিষয়টির নাম থেকেই গৌড় জনপদের উৎপত্তি হয়েছে। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্কের সময় থেকেই গৌড় রাজ্য নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেন আমলে মালদহ জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামে পরিচিত ছিল। শশাঙ্কের অধীনে গৌড়, বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। হিন্দু যুগের শেষে 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' প্রধানত এ দুই ভাগে সমগ্র বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনেকে অনুমান করেন যে, বর্তমান ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত চম্পা নগরী ছিল গৌড় রাজ্যের রাজধানী।
- **বঙ্গ :** ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ জনপদটি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থিত ছিল। এর পশ্চিম সীমা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের আমলে বঙ্গের আয়তন সংকুচিত হয়। এ যুগে গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই বঙ্গ জনপদটি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। হেমচন্দ্র রচিত 'অভিধান চিন্তামণি' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব উপকূল বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরবর্তীকালে পাল রাজাদের আমলে বঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা- উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের দানপত্রে দক্ষিণ বঙ্গের উল্লেখ আছে। প্রাচীন শিলালিপি থেকে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়- একটি বিক্রমপুর, অন্যটি নাব্য। অবশ্য বর্তমানকালে বিক্রমপুর চিহ্নিত করা গেলেও নাব্য নামের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি।
- **পুণ্ড্র :** প্রাচীন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল পুণ্ড্র। পুণ্ড্র নামে এক প্রাচীন জাতির উল্লেখ বৈদিক গ্রন্থে এবং রামায়ণ ও মহাভারত- এ দুই মহাকাব্যে পাওয়া যায়। এরা উত্তর বাংলার অধিবাসী ছিল বলে এ অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল। মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্বে বলা হয়েছে যে, গঙ্গা নদীর পূর্বভাগে পুণ্ড্রদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভবিষ্যৎ পুরাণে বলা হয়েছে, গৌঢ়, বরেন্দ্র, নীবিতি, রাঢ়, ঝাড়খণ্ড, বরাহভূমি এবং বর্ধমান- এই সাতটি প্রদেশ পুণ্ড্র দেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। পরবর্তীকালে এর নাম হয় পুণ্ড্রনগর।
- **বরেন্দ্র :** বরেন্দ্র, বারেন্দ্রী বা বরেন্দ্রভূমি নামে উত্তর বাংলায় আর একটি জনপদের কথা জানা যায়। অনুমান করা হয়, পুণ্ড্রেরই একটি অংশ জুড়ে বরেন্দ্র জনপদ গড়ে উঠেছিল। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তার 'রামচরিত' গ্রন্থে এই রাজ্যকে গঙ্গা নদীর পূর্বভাগে অবস্থিত লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি অবস্থিত ছিল।
- **রাঢ় :** ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত রাঢ়দেশ উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়- এ দুই অংশে বিভক্ত ছিল। অজয় নদ ছিল দুই রাঢ়ের সীমারেখা। শ্রীধরাচার্যের 'ন্যায়কাণ্ডালি' গ্রন্থে দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ আছে। বর্তমান হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলার কিছু অংশ নিয়ে দক্ষিণ রাঢ় গঠিত ছিল। রাঢ়দেশের উত্তরাঞ্চল উত্তর রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। এ ভূ-খণ্ড বর্ধমান জেলায় অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাণ্ডি রাঢ়দেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল।
- **সমতট :** পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের প্রতিবেশী জনপদ হিসেবে ছিল সমতটের অবস্থান। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে সমতট ভ্রমণ করে একটি বিবরণী লিখেন। গঙ্গা ও ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত প্রসারিত ভূভাগ ছিল সমতটের অন্তর্গত। অনেকে মনে করেন, বর্তমান কুমিল্লার বড় কামতা ছিল এ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'র রচয়িতা হরিষেণের রচনা থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্তের সময় সমতট একটি করদ রাজ্য ছিল। সম্ভবত গুপ্ত সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে বৈস্যগুপ্ত ৫০৭-৬০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবে স্বাধীন সমতট রাজ্যের উত্থান ঘটে।



Scanned by CamScanner

- **চন্দ্রদ্বীপ :** বঙ্গের অন্তর্গত আরেকটি জনপদ হলো চন্দ্রদ্বীপ। ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগের সুপ্রসিদ্ধ 'বাকলা' প্রদেশ এবং চন্দ্রদ্বীপকে একই স্থান বলে মনে করেন। বর্তমান বরিশাল জেলায় এটি অবস্থিত ছিল। অনেকে মনে করেন, প্রাচীনকালে অনেক ভূখণ্ড এ নামে পরিচিত ছিল।

- **হরিকেল :** হরিকেল জনপদের অবস্থান ছিল বাংলার পূর্বপ্রান্তে। সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত হরিকেল গঙ্গা সমতটের সংলগ্ন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর থেকেই হরিকেলকে বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত বলে ধরা হয়। মনে করা হয়, আধুনিক সিলেটই ছিল হরিকেল জনপদ।

- **গঙ্গারিডই :** গ্রিক লেখকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন বাংলায় গঙ্গারিডই নামের এক শক্তিশালী রাজ্যের অবস্থান ছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, রাজ্যটি গঙ্গা নদীর তীরে কোনো এক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

- **বঙ্গাল :** দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন লিপি এবং শামস-ই-সিরাজ আফিফ রচিত তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে বঙ্গ এবং বঙ্গাল এ দুটি নামই আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ দুটি স্থানকে একই স্থান বলে গণ্য করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "বাংলার প্রকৃত নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীন বঙ্গের শাসকগণ সমগ্র প্রদেশ ব্যাপী দশ গজ উঁচু এবং বিশ গজ প্রশস্তের আল নির্মাণ করতেন। বঙ্গের সাথে এই আল শব্দের সংযোগে বঙ্গাল নামের উৎপত্তি হয়েছে"।

- **তাম্রলিপ্ত :** তাম্রলিপ্ত ছিল বাংলার একটি বিখ্যাত বন্দর। মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। মেদিনীপুর জেলায় এই বন্দরটি অবস্থিত ছিল। টলেমীর ভৌগোলিক বিবরণীতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এ বন্দরনগরী থেকে সমুদ্র পথে সিংহল, জাভাদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত।

- **সিংহপুর :** প্রাচীন বাংলার নগরসমূহের মধ্যে সিংহপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। হুগলি জেলায় এটি অবস্থিত ছিল। হুগলি জেলার সিংগুড়ই সিংহপুর ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।

- **পুষ্কর্ণ :** রামায়ণ ও মহাভারতে 'পুষ্কর্ণ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ নগরটি দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয়।

- **কোটিবর্ষ :** প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে এ নগরটি খ্যাতি লাভ করে। কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। তবে, অনেকেই মনে করেন এটি রাঢ় জনপদের রাজধানী ছিল।

- **পাহাড়পুর :** পাহাড়পুর বর্তমান নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের আমলে এটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত অষ্টম শতকে এখানে পাল রাজত্বের রাজধানী গড়ে উঠেছিল এবং তা উপমাহাদেশে মুসলিম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

- **মহাস্থানগড় :** বাংলাদেশের বর্তমান বগুড়া জেলা শহর থেকে আট মাইল উত্তরে মহাস্থানগর অবস্থিত। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় পনের শতক পর্যন্ত মহাস্থানগর সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসেবে গড়ে উঠে।

- **কর্ণসুবর্ণ :** কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতকে তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি নগরের মতো কর্ণসুবর্ণও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এটি বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল।

- **বিক্রমপুর :** বৃহত্তর ঢাকা জেলায় প্রাচীন বিক্রমপুর নগরী অবস্থিত ছিল। সেন বংশীয় রাজাদের আমলে বিক্রমপুর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এটি ছিল সেনদের দ্বিতীয় রাজধানী। বর্তমানে এটি মুন্সিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

**বঙ্গ বা বাংলার আত্মপ্রকাশ :** প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের কোনো নির্দিষ্ট সীমা বা নাম ছিল না। এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। অবশ্য এক সময় গৌড় নামটিই এই সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্গাল পূর্বে পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম ছিল। বঙ্গ ও বঙ্গাল-এ দুটি নামই এক সময় দুটি পৃথক দেশের নাম ছিল। মুসলমানরা এ দেশ জয় করে সমুদয় প্রদেশটিকে বঙ্গাল নামে অভিহিত করে। বঙ্গাল থেকে পরবর্তীতে বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি হয়েছে।

পরিশেষে, বাংলার অখণ্ড স্বাধীন রাজ্যের ক্রমবিকাশে প্রাচীন বাংলার জনপদ ও নগরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এসব ক্ষুদ্র রাজ্যের সমন্বয়ে এক সময় গড়ে উঠে স্বাধীন রাজ্য। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র বাংলা এ দুটি স্বাধীন জনপদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। স্বাধীন রাজ্য উত্থানের যুগে রাজা শশাঙ্ক ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক।



Scanned by CamScanner

## Student Work

# বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফি

জাতীয় পরিকল্পনার জন্য অন্যতম বিষয় হলো আদমশুমারি বা জনগণনা। দেশের পরিমিত সম্পদের সাথে দেশে বসবাসরত জনসংখ্যার সামঞ্জস্য আছে কি-না সে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার জন্য জনগণনা করা হয়ে থাকে। প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্যের সরকারসমূহ মধ্যযুগ থেকে কর আদায় অথবা সামরিকবাহিনীতে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনে কখনো কখনো জনগণনার আশ্রয় নিতেন। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে বিষয়টি অনেকটাই উদ্বেগের। কেননা স্বাধীনতার পরেই ১৯৭৪-এ যে লোকগণনা হয় তাতে দেখানো হয়েছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যা । কিন্তু অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে এ পর্যন্ত জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে তাতে বিষয়টি অবশ্যই শঙ্কার। কেননা এ জনসংখ্যা সমস্যার কারণে দেশে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

**আদমশুমারি বা জনগণনার বৈশিষ্ট্যসমূহ :** জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী আদমশুমারিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন।

১. প্রতিটি ব্যক্তির তথ্য গণনা,
২. একটি চিহ্নিত এলাকায় সামষ্টিক গণনা,
৩. একই সঙ্গে সারাদেশে কার্যক্রম চালানো এবং
৪. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠান।

আদমশুমারির জন্য আরো কিছু তথ্য প্রয়োজন, যেগুলো নিম্নরূপ :

১. **ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য :** জনসংখ্যার সমষ্টি, এলাকা, শহর ও গ্রাম।
২. **ব্যক্তিগত এবং বাড়িসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য :** পরিবারের গঠন, বাড়িতে বসবাসকারী সদস্যদের গঠন।
৩. **অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য :** আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নির্ভরতা ইত্যাদি।

আদমশুমারির জন্য মূলত দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে : যথা-

(i) **Dejure বা আইনত :** এ পদ্ধতিতে প্রতিটি মানুষকে তার প্রকৃত আবাসিক এলাকা অনুযায়ী গণনা করা হয়ে থাকে।

(ii) **Defacto বা কার্যত :** এ পদ্ধতিতে মানুষের প্রকৃত বাসস্থান যাই থাক না কেন ব্যক্তির শুমারিকালীন উপস্থিতি অনুযায়ী তাকে যে কোনো স্থান থেকে গণনা করা হয়ে থাকে।

১৮৭১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ দেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য : জনগণনা বা আদমশুমারিতে ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, শিক্ষার হার, জন্ম-মৃত্যু হার, শিশুর জন্ম-মৃত্যুর হার ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়। বাংলায় প্রথম আদমশুমারি বা জনগণনা হয় ১৮৭২ সালে এবং সর্বশেষ স্বাধীন বাংলাদেশে হয় ২০১১ সালে। স্বাধীন বাংলাদেশে হয়েছে ৫ বার। নিচে ১৮৭১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

| বছর | অবিভক্ত বঙ্গদেশ | বাংলাদেশ এলাকা |
|---|---|---|
| ১৮৭২ | ৩,৪৬,৯১,৭৯৯ | - |
| ১৮৮১ | ৩,৭০,২০,৫৬৩ | - |
| ১৮৯১ | ৩,৯৮,১২,১৬৫ | - |
| ১৯০১ | ৪,২৮,৮৮,১৯৪ | ২,৮৯,২৭,৭৮৬ |
| ১৯১১ | ৪,৬৩,১২,২৬২ | ৩,১৫,৫৫,০৫৬ |
| ১৯২১ | ৪,৭৫,৯৯,২৩৩ | ৩,৩২,৫৪,০৯৬ |
| ১৯৩১ | ৪,১০,৮৭,৩৩৮ | ৩,৫৬,০৪,১৭০ |
| ১৯৪১ | ৬,০৩,০৬,৫২৬ | ৪,১৯,৯৭,২৯৭ |
| ১৯৫১ | - | ৪,২০,৬২,৬১০ |
| ১৯৬১ | - | ৫,০৮,৪০,২৩৪ |
| ১৯৭৪ | - | ৭,১৪,৭৯,০৭১ |
| ১৯৮১ | - | ৮,৭১,২০,১১৯ |
| ১৯৯১ | - | ১০,৬৩,১৪,৯৯২ |
| ২০০১ | - | ১২,৪৩,৫৫,২৬৩ |
| ২০১১ | - | ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ (অনুমিত) |

উৎস : ইন্ডিয়ার আদমশুমারি (১৯৩১, ১৯৪১) এবং বাংলাদেশের আদমশুমারি (১৯৯১, ২০০১, ২০১১)।



Scanned by CamScanner

**১৮৭১–১৯৪১ সাল পর্যন্ত জনগণনা অনুযায়ী ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য :** ১৮৭২ সালে বাংলায় প্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষের সন্দেহ ও দ্বিধার কারণে প্রথম আদমশুমারি লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারেনি। লক্ষ্য অর্জনে সফল না হলেও এই আদমশুমারি থেকেই বাংলা একটি মুসলিমপ্রধান রাজ্যরূপে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী আদমশুমারিসমূহ ১৮৮৯ এবং ১৮৯১ সালে অনুষ্ঠিত হয়, যা ১৮৭২ সালের আদশশুমারির তুলনায় অনেক বেশি উন্নতমানের ছিল। জনমিতি বিশারদদের মতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি আদমশুমারি গুণগতভাবে যথেষ্ট ভালো ছিল।

১৯৩১-এর আদমশুমারি আংশিকভাবে এবং ১৯৪১-এর আদমশুমারি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারায় তথ্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতির কারণে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই তাদের স্ব স্ব ধর্মের পক্ষে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে। অন্যদিকে পূর্ববাংলার প্রথম আদমশুমারি একটি ভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ ও পূর্ববাংলার মধ্যে দ্বি-মুখী ব্যাপক মাইগ্রেশনের কারণে বিভিন্ন জেলার লোকসংখ্যার গণনা দুরূহ সমস্যায় পড়ে।

**১৯৫১-২০০১ সাল পর্যন্ত জনগণনা অনুযায়ী ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য :** ১৯৫১-২০০১ সাল পর্যন্ত জনগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. এক বা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের সংখ্যা প্রতিটি আদমশুমারিতেই কম দেখানো হয়েছে।

২. ১৯৫১-এর আদমশুমারি সুবিন্যস্তভাবে পরিচালিত হয়নি এবং জাতীয়ভাবে শুমারি-পরবর্তী নিরীক্ষা জরিপও পরিচালিত হয়নি। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে শহর এলাকায় ৫% মানুষ কম গণনা করা হয়েছে ধরা হলেও বাস্তাবে তা আরো বেশি বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তী সময়ে, জাতীয় পর্যায়ে ৪% মানুষ ১৯৫১-এর আদমশুমারিতে কম ধরা হয়েছে অনুমান করে মোট জনসংখ্যার নতুন হিসাব দেখানো হয়। এই আদমশুমারির মোট জনসংখ্যা যে কারণে প্রভাবিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল প্রথমত : ১৯৪১ পরবর্তী সময়ে বিপুল সংখ্যক নেট মাইগ্রেশন (বহির্গমন বেশি, আগমন কম); দ্বিতীয়ত : ১৯৪১ সালের জনসংখ্যা বেশি দেখানো এবং তৃতীয়ত : ১৯৪৩-এর দূর্ভিক্ষ।

৩. সাধারণভাবে ১৯৬১-এর আদমশুমারিকে খুব ভালোভাবে পরিচালিত বলা হলেও বাদপড়া মানুষের সংখ্যা ৮.৬২% ধরে মোট জনসংখ্যা পুনর্বিন্যাস করা হয়।

৪. ১৯৭৪-এর শুমারি-পরবর্তী নিরীক্ষা জরিপের ভিত্তিতে ৪টি প্রধান শহরাঞ্চলে বাদপড়া মানুষের সংখ্যা ১৯.৩% ধরা হয়, অন্যান্য অঞ্চলে তা ৬.৫% ধরা হয়। মোট জনসংখ্যা ৬.৮৮% বাদপড়া মানুষের জন্য পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।

৫. ১৯৮১-এর আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ৩.১% গণনা করা হয়নি ধরে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।

৬. ১৯৯১-এর আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ৪.৬% গণনা করা হয়নি বলে ধরা হয়।

৭. ২০০১-এর অদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ৪.৯৮% গণনার আওতায় আনা যায়নি বলে ধরা হয়।

**২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য :** ২০১১ সালের ১৫-১৯ মার্চ বাংলাদেশের পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়। নিচে ২০১১ সালের আদমশুমারি বা জনগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%।
২. জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০১৫ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ২,৫২৮ জন।
৩. পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০:১০০.৩।
৪. দেশে সাক্ষরতার হার ৫১.৮%। এর মধ্যে পুরুষ ৫৪.১% ও নারী ৪৯.৪৫%।
৫. জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ ঢাকা।
৬. বাংলাদেশে খানাপ্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৪ জন।
৭. গড় আয়ু ৬৯ বছর ইত্যাদি।

**ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা :** স্বাধীন বাংলাদেশে আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হার (%) নিচে দেয়া হলো :

| ধর্ম | ১৯৭৪ | ১৯৮১ | ১৯৯১ | ২০০১ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|---|
| মুসলিম | ৮৫.৪ | ৮৬.৭ | ৮৮.৩ | ৮৯.৭ | ৯০.৭ |
| হিন্দু | ১৩.৫ | ১২.১ | ১০.৫ | ৯.২ | ৮.৫ |
| বৌদ্ধ | ০.৬ | ০.৬ | ০.৬ | ০.৭ | ০.৬ |
| খ্রিস্টান | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ |
| অন্যান্য | ০.২ | ০.৩ | ০.৩ | ০.১ | ০.২ |



Scanned by CamScanner

**উপজাতি জনসংখ্যা ঃ**

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী উপজাতি জনসংখ্যা ১৭ লক্ষ। ২০০১ সালে ছিল ১৪ লক্ষ। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যানে মোট উপজাতি জনসংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ। প্রধান প্রধান উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মনিপুরি, সাঁওতাল, গারো, মুরং, তঞ্চইঙ্গ্যা এবং রাখাইন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উপজাতি জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি পার্বত্য চট্টগ্রামে।

আদমশুমারির প্রয়োজনীয়তা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মূলত জাতীয় পরিকল্পনার কারণে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতির কারণে। এ বৃদ্ধি আগামী চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে ঘটতে থাকবে। এই চলমান প্রক্রিয়ায় শিশু জনসংখ্যার হার দ্রুত হ্রাস পাবে, কর্মক্ষম জনংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, জনসংখ্যার নির্ভরতা অনেক কমে যাওয়ায় নীতি নির্ধারকদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ আসবে। উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। পপুলেশন মোমেন্টাম চলাকালীন সময়ে দেশের বৃদ্ধ মানুষের আনুপাতিক হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং পরবর্তীকালে জনসংখ্যার নির্ভরতা হারও বৃদ্ধি পাবে। ওই সময়ে আরো একটি প্রক্রিয়া বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় প্রচন্ড প্রভাব ফেলবে এবং তা হলো ব্যাপক গ্রাম থেকে শহরে মাইগ্রেশন। ঐ মাইগ্রেশনের ফলে খুব দ্রুত বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পেতে হলেও আদমশুমারির নির্ভুল গণনার বিকল্প নেই। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জনমিতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিণতি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলেও বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার সঠিক গণনা প্রয়োজন।

## Student Work : জনসংখ্যার সোনালী ধাপ বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট

বর্তমানে বাংলাদেশ জনসংখ্যা কাঠামোগত দিক থেকে একটি বিশেষ অবস্থানে রয়েছে। যা জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে সহায়ক। মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি ৭৬ লাখ মানুষ ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ। ১০ থেকে ৩৯ বছর তরুণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ। আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছর বাংলাদেশ এরকম সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে জনসংখ্যার এই বিশেষ কাঠামো। বিশ্বে অধিক জন্মহারের অনেক দেশই এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে। যখন তরুণরা এক তৃতীয়াংশ বা তার বেশি হয়েছে তখনই দেশগুলোর পরবর্তী উন্নয়নের গতিমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যার দিক থেকে দারুণ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। দেশের প্রতি তিনজনে দুই জনই উপার্জনক্ষম। নির্ভরশীল ও বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় সঞ্চয় বাড়ছে।

**জনসংখ্যার সোনালী ধাপ বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট :**

জনসংখ্যার সোনালী ধাপ বলতে বুঝায় নির্ভরশীল জনসংখ্যার চেয়ে অধিক কর্মক্ষম জনসংখ্যা। একটি দেশের জনসংখ্যার এই বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট। এই সময়কালীন সময়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়। চারটি পর্যায়ে একটি দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়-

১। **উচ্চ স্থুল জন্মহার এবং উচ্চ স্থুল মৃত্যুহার ঃ** এই পর্যায়ে জনসংখ্যার স্বল্প বৃদ্ধি ঘটে বা কোন পরিবর্তন ঘটে না।
২। **উচ্চ স্থুল জন্মহার এবং ক্রমহ্রাসমান নিম্ন স্থুল মৃত্যুহার ঃ** এই পর্যায়ে জনসংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।
৩। **হ্রাসমান স্থুল জন্মহার এবং নিম্ন স্থুল মৃত্যুহার ঃ** এই পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থির থাকে।
৪। **নিম্ন স্থুল জন্মহার এবং নিম্ন উচ্চ স্থুল মৃত্যুহার ঃ** এই পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য বা ঋণাত্মক। বাংলাদেশ বর্তমানে উপরে বর্ণিত চারটি পর্যায়ের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে।

**জনসংখ্যার সোনালী ধাপ ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা :**

বর্তমানে বাংলাদেশে চমৎকার জনসংখ্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভোক্তা থেকে উৎপাদক শ্রেণি বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট জনসংখ্যার ৬৫ ভাগ উপার্জনক্ষম, অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী। এখন তরুণের চেয়ে বৃদ্ধের সংখ্যা কম। ২০৫০ সালে তরুণের চেয়ে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়বে।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বর্তমান পরিস্থিতিকে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, একটি জাতির জীবনে এধরনের পরিস্থিতি একবারই আসে। এ সুবিধা সামগ্রিকভাবে যত ভালভাবে ব্যবহার করা যায়, জাতীয় উন্নয়নও তত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। যুবশক্তির সুবিধা কাজে লাগাতে না পারলে ঐ রাষ্ট্র অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবেই টিকে থাকে। তাই বাংলাদেশের কর্মক্ষম তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের উন্নয়নে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।



Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা-সুবিধার মত পরিস্থিতি নিয়ে ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পূর্ব এশীয় দেশ চীন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া উন্নতি করেছিল। চীন বিপ্লবের পথ সুগম এবং এর পরের উত্থান ঘটেছে তারুণ্যের এমন বিস্ফোরণেই। ১৯৬০-এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়া এবং নাইজেরিয়া একইরকম জনসংখ্যা সুবিধা অর্জন করেছিল। কোরিয়া যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। আর নাইজেরিয়া এতে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ না করায় অনুন্নত দেশই রয়ে গেছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট থেকে বাংলাদেশের সামনে যে সম্ভাবনাগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো হলঃ

০১। **দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ঃ** জনসংখ্যার সোনালী ধাপে বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ দক্ষ বা কর্মক্ষম শ্রমশক্তি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই শ্রম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈপ্লাবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

০২। **শিল্পায়নের সুযোগ ঃ** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পখাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২৯ শতাংশ। শিল্পের প্রসারের জন্যে অন্যতম প্রধান উপাদান হল দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বাংলাদেশের জন্য সেই সুযোগ বয়ে এনেছে। তাই জনসংখ্যার এই বিশেষ অবস্থাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটানো সম্ভব।

০৩। **মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া ঃ** বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এর ফলে প্রাপ্ত জনসংখ্যা সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া নিশ্চিত করা সহজতর হবে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ১ জুলাই তারিখে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে।

০৪। **সরকারি আয় বৃদ্ধি ঃ** বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে সরকারের কর ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সহজতর হবে।

০৫। **শিল্প পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ** ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাণিজ্য ভারসাম্য দেশের অনুকূলে আনা সম্ভব হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য সমাদৃত হচ্ছে। উৎপাদনের সুযোগ বা স্বল্পতার কারণে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়ে আছে।

০৬। **বাণিজ্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে ঃ** বর্তমান বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর দেশ। বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাণিজ্য ভারসাম্য দেশের অনুকূলে আনা সম্ভব হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য সমাদৃত হচ্ছে। উৎপাদনের সুযোগ বা স্বল্পতার কারণে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়ে আছে।

বাণিজ্য ভারসাম্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

| সন | আমদানী | রপ্তানী | ভারসাম্য |
|---|---|---|---|
| ২০১০-১১ | ৩৩৬৫৮ | ২২৯২৮ | (-) ১০৭৩০ |
| ২০১১-১২ | ৩৫৫১৬ | ২৪৩০২ | (-) ৫৯৮১৮ |
| ২০১২-১৩ | ৩৪০৮৪ | ২৭০২৭ | (-) ৭০৫৭ |
| ২০১৩-১৪ | ৪০৭৭২ | ৩০১৭৬ | (-) ১০৫৯৬ |

০৭। **পুঁজিপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবেঃ** ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে পুঁজিপ্রবাহ নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ পুঁজিপ্রবাহের বৃদ্ধি ঘটবে।

০৮। **বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিঃ** দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রমশক্তির ওপর নির্ভর করে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের পুঁজিবিনিয়োগে আগ্রহী হবে। তাই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত ৮টি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ এসেছে যার পরিমাণ ৩০০১.৭৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৮.৬৯ শতাংশে। এরমধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২১.৭৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২১.৩৯ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৬৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

০৯। **অভ্যন্তরীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারঃ** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে এবং এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদকে পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।



Scanned by CamScanner

**জনসংখ্যার সোনালী ধাপের চ্যালেঞ্জসমূহ :**

০১। যথাযথ ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করণ;
০২। বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
০৩। নারী শিক্ষার প্রসার এবং তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা;
০৪। বিশাল কর্মক্ষম শ্রমশক্তির ব্যবহার করে বিশাল পরিমাণ শিল্প পণ্য উৎপাদন এবং এগুলোকে বিশ্ব বাজারে রপ্তানির জন্য নতুন বাজার নিশ্চিত করা;
০৫। বাংলাদেশের খাদ্য সরবরাহ এবং আবাসন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট খাদ্য সরবরাহ এবং আবাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তাই এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ও
০৬। গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের চাপ বৃদ্ধিকে মোকাবেলা করা ইত্যাদি।

২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে। জনসংখ্যার এ সুবিধাকে কাজে লাগাতে না পারলে বাংলাদেশ শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে না। তাই বিশাল তরুণ এবং উপার্জনক্ষম জনগোষ্ঠীকে ভাল উপার্জনকারীতে পরিণত করতে হবে। এখনই তারুণ্যের শক্তিকে ব্যবহার ও দক্ষতার উন্নয়নে বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নইলে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। আর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট থেকে সৃষ্ট সুযোগগুলোও কাজে লাগানো সম্ভব হবে না।

## Teacher Work বাংলাদেশের নদী প্রণালী

**নদ নদী ঃ**

ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৭০০ নদী সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। তবে নদীগুলি দেশের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরাঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অংশের চেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নদীর সংখ্যা অনেক বেশি এবং আকৃতিতেও অনেক বড়। বাংলাদেশের সমস্ত নদনদী, ক্ষুদ্র জলস্রোত, খাড়ি, খাল ইত্যাদির মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কি.মি.। নদী দৈর্ঘ্য, নিষ্কাশন অঞ্চল ও প্রবাহ পরিমানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের কয়েকটি নদী পৃথিবীর বড় বড় নদীগুলির মধ্যে অবস্থান করে। এদেশের নদীগুলোর অধিকাংশই দক্ষিণমুখী প্রবাহিত, বাংলাদেশের নদীগুলি আবার চারটি বৃহৎ নদী প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত :

১। ব্রহ্মপুত্র – যমুনা নদী প্রণালী
২। গঙ্গা – পদ্মা নদী প্রণালী
৩। সুরমা – মেঘনা নদী প্রণালী এবং
৪। চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদীমালা।

**০১। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী প্রণালী ঃ**

ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বতের মানস সরোবর থেকে সাংপো নামে উৎপন্ন হয়ে ভারতের অরুণাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে প্রবাহিত হয়েছে। প্রবাহপথে পাঁচটি প্রধান উপনদী থেকে ব্রহ্মপুত্র পানি সংগ্রহ করেছে যাদের মধ্যে ডিহং এবং লুহিত উল্লেখযোগ্য। এ ধারা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এখান থেকে নদীর নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা। অধিকতর ক্ষেত্রে যমুনা নামেই পরিচিত। এ ধারা দক্ষিণে ২৭৭ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে আরিচার কাছে আলেকদিয়ায় পদ্মা (গঙ্গা) নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত ধারা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ২১২ কি.মি প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় পতিত হয়েছে।

দেশের উত্তর প্রান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী প্রণালীর উপনদীগুলি হচ্ছে ধরলা, দুধকুমার, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই। ধরলা ও দুধকুমারের উৎপত্তি হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে। তিস্তা উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর একটি। ১৭৮৭ সালের পূর্বে এটি করতোয়া, আত্রাই এবং যমুনেশ্বরী নদীর প্রধান উৎস ছিল। ১৭৮৭ সালে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প মতান্তরে বন্যার ফলে তিস্তার মধ্যে দিয়ে বিপুল পরিমাণ বালুস্রোত প্রবাহিত হয়ে আত্রাই এর সাথে জমা হওয়ায় তিস্তার প্রবাহ সবলে ঘাঘট নদীতে প্রবাহিত হতে থাকে। এখনও এ প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। চিলমারীর দক্ষিণে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দুধকুমার একটি ছোট নদী, এটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। করতোয়া যমুনার দীর্ঘতম উপনদী। এর মূলধারা ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়ে পঞ্চগড় জেলার ভিটগড়ের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। করতোয়া নদী উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত।



Scanned by CamScanner

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর বামতীরে ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য শাখা নদী নেই। তবে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বাহাদুরাবাদের নিকট থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে জামালপুর ও ময়মনসিংহ শহরের পাশদিয়ে প্রবাহীত হয়ে ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনায় পতিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের বর্তমান যমুনা নদী বরাবর স্থানান্তরের পূর্বে এটিই ছিল ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা। এ নদীর শাখানদীগুলি হচ্ছে বংশী, বানার, শ্রীকালী ও সাতিয়া। বংশী নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে তুরাগ নদীর সঙ্গে মিলিত ধারা ঢাকার অদূরে বুড়িগঙ্গায় পতিত হয়েছে। বানার, শ্রীকালী ও সাতিয়ার মিলিত প্রবাহ শীতলক্ষ্যা নামে প্রবাহিত হয়ে মুন্সিগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশেছে। ধলেশ্বরী যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরের বড় শাখানদী। এটি পার্বতী থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জের কাছে শীতলক্ষ্যায় পতিত হয়েছে। শীতলক্ষ্যা আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গজারিয়ার নিকট মেঘনায় পতিত হয়েছে।

**০২। গঙ্গা-পদ্মা নদী প্রণালী ঃ**

হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে নির্গত ভাগীরথী এবং মধ্য হিমালয়ের নন্দাদেবী শৃঙ্গের উত্তরে অবস্থিত গুরওয়াল থেকে উৎপন্ন আলোকনন্দা নদীর মিলিত ধারা গঙ্গা নাম ধারণ করে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পৌছেছে। এ ধারা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাজমহল পাহাড়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। এরপর রাজশাহী জেলায় বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় ১১২ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা নামে কুষ্টিয়া জেলার উত্তর প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর আরিচার কাছে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়ে পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় পতিত হয়েছে। পদ্মার মোট দৈর্ঘ্য ৩২৪ কি.মি.।

উত্তর দিক থেকে আগত গঙ্গার প্রধান উপনদী মহানন্দা। দার্জিলিং এর নিকটবর্তী মহালড্রীম মতান্তরে মহালদিরাম পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ নদী পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সীমান্ত এলাকা হয়ে ভারতের পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নবাবগঞ্জের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গোদাগাড়ীর কাছে গঙ্গায় পতিত হয়েছে। নাগর, টাঙ্গন ও পুনর্ভবা মহানন্দার উপনদী।

বড়াল গঙ্গার বামতীরের শাখানদী, এ নদী চারঘাটের নিকট উৎপন্ন হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাটমাহরের কাছে পৌছে। এরপর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে আত্রাই-করতোয়ার সঙ্গে মিশেছে। এ মিলিত ধারা হুরসাগর নাম নিয়ে যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। গঙ্গার আরেকটি শাখানদী ইছামতি। এটি পাবনা শহরের দক্ষিণে গঙ্গা থেকে বের হয়ে পাবনা শহরকে দু'ভাগ করে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বেড়া থানার পাশ দিয়ে হুরসাগরে পড়েছে।

**০৩। সুরমা-মেঘনা নদী প্রণালী ঃ**

বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী মেঘনার দৈর্ঘ্য ৬৯৯ কিলোমিটার। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত সম্পন্ন অঞ্চলের একটি ধারা মেঘনা নদীর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। নদীটির উৎপত্তি ভারতের শিলং ও মেঘালয় পাহাড়ে। এর প্রধান উৎস বরাক নদী। সিলেট জেলার অমলশিদে বাংলাদেশ সীমান্তে বরাক নদী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সিলেট অববাহিকার উত্তরে প্রবাহিত হয়ে সুরমা নদী খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে আগত একাধিক উপনদী গ্রহণ করেছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উল্লেখযোগ্য উপনদী হচ্ছে লুবা, কুলিয়া, পিয়াইন, বোগাপানি, সোমেশ্বরী ও কংস। ত্রিপুরা পাহাড় থেকে আগত একাধিক নদীকে কুশিয়ারা উপনদী হিসেবে গ্রহণ করেছে যাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মনু নদী। সুরমার উপনদীগুলির তুলনায় কুশিয়ারার উপনদীগুলি কম খরস্রোতা, তবে আকস্মিক বন্যা প্রবণ।

**০৪। চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদী প্রণালী ঃ**

দেশের অন্যান্য নদী প্রণালী থেকে এ নদী প্রণালী বিচ্ছিন্ন। এ অঞ্চলের প্রধান নদী কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এর উপৎপত্তিস্থল মিজোরামের লুসাই পাহাড়। রাঙ্গামাটি এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পতেঙ্গার সন্নিকটে এটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। কাপ্তাই নামক স্থানে এ নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এ অঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদী হলো ফেনী, মুহুরী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী বাকখালি এবং নাফ।

এই চারটি নদী প্রণালীর মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে নদীগুলি তাদের সর্বোচ্চ পরিমাণে প্রবাহিত হয় এবং মোট প্রবাহমাত্রা দাঁড়ায় প্রায় ১৪০,০০০ কিউসেক এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ ৭,০০০ কিউসেক-এ হ্রাস পায়।



Scanned by CamScanner

## Student Work

# সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি

বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি আলোচনায় এসেছে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পরে। উক্ত দুই দেশের সাথে সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বাংলাদেশ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮শ ১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকা এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল এক্সক্লুসিভ ইকোনমি জোনের মালিকানা পায়। এর ফলে সমুদ্র অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লাবিক পরিবর্তন সাধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

### ব্লু ইকোনমি

গান্টার পাওলি 'ব্লু ইকোনমি' ধারণাটির জনক। তাঁর রচিত 'The Blue Economy 10 Years-100 Innovations-100 Million Jobs' বইটিতে প্রথম ব্লু ইকোনমি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আর ব্লু ইকোনমি এর প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ হল সমুদ্র অর্থনীতি। সমুদ্র অর্থনীতির মূল উপাদান হচ্ছে মৎস্য সম্পদ ও সমুদ্রের অভ্যন্তরে বিদ্যমান তেল-গ্যাসসহ অন্যান্য অফুরন্ত খনিজ সম্পদ। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমনঃ আমদানি-রপ্তানিতে সমুদ্র পরিবহন, সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন অর্থনীতি, বন্দর অর্থনীতি, তেল-গ্যাস-খনিজ ও সমুদ্র সম্পদের উত্তোলন, উৎপাদন এবং এগুলোর ব্যাপক বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক গতি, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ইত্যাদি হল সমুদ্র অর্থনীতির মূল উপাদান। এক কথায়, সমুদ্রের জলরাশি, সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্রকে ঘিরে গড়ে ওঠা অর্থনীতিকে বলা হয় 'ব্লু ইকোনমি' বা সমুদ্র অর্থনীতি।

জাতিসংঘের উদ্যোগে মেক্সিকোর রিও ডি জেনেরিও শহরে ২০১২ সালের ২০-২২ জুন অনুষ্ঠিত হয় টেকসই উন্নয়ন ও ধরিত্রী সম্মেলন (Rio+20)। এ সম্মেলনের মূল এজেন্ডা ছিল সবুজ অর্থনীতি। সেখানে সবুজ অর্থনীতিকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সম্মেলনে একই সাথে উঠে আসে ব্লু ইকোনমি'র ধারণা। সেখানে উপকূলীয় ও দ্বীপ সমৃদ্ধ দেশগুলোর পক্ষ থেকে সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব শক্তভাবে তুলে ধরা হয়।

### সমুদ্র অর্থনীতি ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ডের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫শ ৭০ বর্গ কিলোমিটার। মায়ানমার ভরতের সাথে সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বাংলাদেশ যে বিশাল সমুদ্র এলাকার মালিকানা পেয়েছে তা মূল ভূ-খণ্ডের ৮০ শতাংশের বেশি। উপরন্তু এই বিশাল সমুদ্র এলাকায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ জৈব ও অজৈব সম্পদ। সমুদ্র এলাকার সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর ও ব্রাজিলের মত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। সমুদ্র সম্পদ বাংলাদেশের সামনে যেসব সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত করেছে সেগুলো হলঃ

০১। **সমুদ্র পরিবহন ও বন্দর অর্থনীতি চাঙ্গা করাঃ** সমগ্র বিশ্বে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৮০ ভাগ সম্পন্ন হয় সমুদ্র পথে। আঙ্কটাডের তথ্য মতে পরবর্তী বছরগুলোতে সমুদ্র বাণিজ্যের পরিমাণ ৪.৩% হারে বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের ৩টি বন্দরের (চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা) কাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে উপকূলীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে ট্রানজিট সুবিধা সম্প্রসারিত করতে পারলে ব্যাপক লাভবান হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ও নিকট প্রতিবেশী অনেক রাষ্ট্র ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সমুদ্র অর্থনীতি বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ও সমুদ্র পথকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে পর্যাপ্ত আয়ের সুযোগ সামনে এনে দিয়েছে।

০২। **জৈব সম্পদের ব্যবহারঃ** বাংলাদেশের মালিকানাধীন সমুদ্র এলাকায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জৈব সম্পদ। এগুলো থেকে নুতন ধরনের খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, প্রসাধনী ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। ৪৮০০ মেরিন অর্গানিজম থেকে প্রায় ১৮০০০ হাজার প্রাকৃতিক পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৮ সনের মধ্যে এসব পণ্যের বাণিজ্যের পরিমাণ ৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বাংলাদেশের সামনেও জৈব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

০৩। **নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রাপ্তিঃ** সমুদ্র স্রোত, উপকূলবর্তী বায়ু প্রবাহ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নবায়ণযোগ্য জ্বালানি বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশও নিজস্ব সমুদ্র এলাকার এই উৎসগুলোকে ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি সংকটের সমাধান করতে পারে।

০৪। **তেল এবং গ্যাস উত্তোলনঃ** বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের মালিকানাধীন সমুদ্র এলাকার তলদেশে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস এবং তেলের মজুদ রয়েছে। বাংলাদেশ এই তেল ও গ্যাস উত্তোলন করতে সমর্থ হলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক চিত্র পাল্টে যাবে। উত্তোলিত তেল ও গ্যাস অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে সক্ষম হলে সরকারি ব্যায় হ্রাস পাবে। কারণ সরকার জ্বালানি আমদানি করার জন্যে বিশাল অংকের অর্থ ভর্তুকি দিয়ে আসছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত জ্বালানি বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে।



Scanned by CamScanner

০৫। **মৎস্য সম্পদ থেকে উপার্জনঃ** বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমা মৎস্য সম্পদ ও জলজ প্রাণীর এক বিশাল ভাণ্ডার। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ। বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রতিবছর ৮০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরা পড়ে। এর মধ্যে মাত্র ০.৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরে দেশের জেলেরা। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিশিং ট্রলার ও প্রযুক্তির অভাবে ২০০ নটিক্যাল মাইলের ভেতর ও বাইরের গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ থেকে কোনো আয় করতে পারছে না বাংলাদেশ। অথচ মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরনের মাধ্যমে মৎস্য রপ্তানি করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব।

০৬। **লবণ উৎপাদন ও রপ্তানিঃ** বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রিফাইনারী ইউনিটের মাধ্যমে বাংলাদেশে লবণ উৎপাদিত হচ্ছে। বিশাল উপকূলবর্তী এলাকার সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ লবণ উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। এতে করে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্রের লোনা পানিকে আটকে সূর্যের তাপ ব্যবহার করে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লাখ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ১.৫ মিলিয়ন টন লবণ রফতানি করতে পারে।

০৭। **জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের প্রসারঃ** সমুদ্র পথে বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রধান বাহন সামুদ্রিক জাহাজ। এক্ষেত্রে সামুদ্রিক জাহাজ রপ্তানি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। সরকার এ সেক্টরকে ইতোমধ্যে থ্রাষ্ট সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাহাজ তৈরির Tonnage বিবেচনায় এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পাশাপাশি জাহাজ শিল্পও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে জাহাজ ভাঙা শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এ শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান আজ বিশ্বে দ্বিতীয়, পৃথিবীর মোট জাহাজ ভাঙার ২৪.৮% সম্পাদিত হয় চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে।

০৮। **ধাতব ও মূল্যবান খনিজ উত্তোলনঃ** সমুদ্র তলদেশে কপার, ম্যাগনেসিয়াম এবং নিকেল এর মত ধাতব খনিজের মজুদ রয়েছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে ভারী খনিজেরও সন্ধান পাওয়া গেছে যেমন– ইলমেনাইট, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, জিরকন, কোবাল্টসহ অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদ – যার বৈদেশিক রপ্তানি মূল্য অনেক। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের সূত্র মতে, কক্সবাজারে সৈকত বালিতে মোট খনিজের প্রাক্কলিত মজুদের পরিমাণ প্রায় ৪০ লাখ টন। আর প্রকৃত সমৃদ্ধ খনিজের পরিমাণ প্রায় ১৮ লাখ টন।

০৯। **পর্যটন অর্থনীতিঃ** সমুদ্র অর্থনীতির এক বিশাল ক্ষেত্র হচ্ছে সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন। একই সাথে এটি বিশ্বব্যাপী আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী অন্যতম উৎস। বিশ্বব্যাপী ২০০ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান করেছে পর্যটন খাত। যা বর্তমানে ক্রমবর্ধনশীল। বিশ্বের ৮৩ ভাগ দেশে পর্যটন হচ্ছে ৫টি বৃহত্তম অর্থনৈতিক খাতের অন্যতম। এক্ষেত্রে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত কক্সবাজার ও অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমুদ্র সৈকত নিয়ে বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। সমুদ্র অর্থনীতির বিকাশে এ খাত থেকে আসতে পারে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্ব।

**সমুদ্র অর্থনীতি ও বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ**

সমুদ্র অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এগুলো হলঃ

০১. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবলের অভাব;
০২. প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতা;
০৩. সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা;
০৪. বিশাল সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
০৫. সমুদ্র এলাকার পরিবেশ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব;
০৬. অবকাঠামোগত দুর্বলতা;
০৭. খনিজ সম্পদ উত্তোলনকালীন সময়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি না করা ও
০৮. যথাযথ সরকারি উদ্যোগ, নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রীতা ইত্যাদি।

সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো থেকে প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সরকারের সদিচ্ছা ও জনগণের সহযোগিতা। সরকার ইতোমধ্যে এই সেক্টরে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার পাশাপাশি কক্সবাজারে একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিশাল সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করাও একান্ত জরুরী।



Scanned by CamScanner

Teacher Work

# জলবায়ু

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এদেশের জলবায়ুর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশের দক্ষিণে বিশাল সমুদ্র এবং বাকি তিন দিকে স্থলভাগ। দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাহাড়িয়া অঞ্চল, এর মধ্য ভাগ এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে উচ্চভূমি এবং বাকি অংশ নদী বিধৌত প্লাবন সমভূমি। বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং সমুদ্রের অবস্থানের কারণে এদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতের অবস্থানের কারণে শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা হিমশীতল বায়ু প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। আবার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থাকায় গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে এনে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চলে বাধা পেয়ে দেশের উপর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এর ফলে বাংলাদেশে শীত ও গরমের তীব্রতা কম। বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। বিশ্বের অন্যান্য ক্রান্তিয় অঞ্চলে বড় বড় মরুভূমি অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে পর্বত প্রাচীর, আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে বলেই এদশে এমন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল। বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পূর্ণভাবে মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এক কথায় বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। আদ্র গ্রীষ্মকাল, মৃদু শীতকাল, সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা ও প্রচুর বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট বর্ষাকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

**ঋতু চক্র ঃ**

ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে বছরে সুস্পষ্ট তিনটি ঋতুর উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। যথা –

ক) শুষ্ক শীতকাল যা নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

খ) মার্চ থেকে মে পর্যন্ত স্থায়ী প্রাক-মৌসুমি বায়ুপূর্ণ গ্রীষ্মকাল; এবং

গ) জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিস্তৃত বর্ষাকাল

এছাড়াও মার্চ মাসটিকে বসন্ত ঋতু এবং মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত সময়কে হেমন্ত ঋতু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে দেশের পশ্চিম-মধ্যভাগে প্রথমে শুষ্ক ঋতুর আবির্ভাব ঘটে এবং প্রায় চার মাস কাল এখানে এ ঋতু বিরাজমান থাকে। এরপর তা ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিণভাগে অগ্রসর হয় এবং মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তীয় এলাকা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। এখানে এ মৌসুমের ব্যপ্তিকাল এক মাসের মতো। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি উচ্চ চাপ কেন্দ্র অবস্থান করে। এ উচ্চ চাপ কেন্দ্র থেকে একটি শীতল মহাদেশীয় শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

প্রাক-মৌসুমি বায়ুর পূর্ববর্তী গ্রীষ্মকালের বৈশিষ্ট্য হল অধিক তাপমাত্রা ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি। এপ্রিল মাসকে উষ্ণতম মাস হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ মাসে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াসে এবং পশ্চিম-মধ্যভাগে তা ৩১° সে-এ পৌছায়। পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কখনো কখনো ৪০° সে ছাড়িয়ে যায়।

**তাপমাত্রা ঃ**

জানুয়ারী শীতলতম মাস। তবে এসময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শীতকালীন শীতল বায়ু প্রবাহ দেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে পৌছতে পৌছতে এর তীব্রতা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে। জানুয়ারিতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ১৭° সে এবং উপকূলীয় এলাকায় তা ২০°-২১° সে.-এ বিরাজ করে। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অংশে তাপমাত্রা একেবারে হিমাঙ্কের কাছাকাছি ৪° থেকে ৭° সে-এ নেমে আসে। শীতকাল এগিয়ে গিয়ে প্রাক মৌসুমি উষ্ণ ঋতুতে উত্তরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এপ্রিল মাসে তা সর্বোচ্চে পৌছায়। এপ্রিলে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ২৭° সে. এর মতো এবং সর্বপশ্চিম-কেন্দ্রীয় অংশে এ তাপমাত্রা থাকে ৩০° সে. এর মতো। রাজশাহী এবং কুষ্টিয়া জেলার কিছু কিছু স্থানে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৪০° সে. কিংবা তার ও অধিক উঠে থাকে। এপ্রিল মাসের পরে গ্রীষ্মকালীন মাসগুলিতে তাপমাত্রা সমান হারে হ্রাস পেতে থাকে। এ সময়ে বর্ষা মৌসুমের শেষ দিকে আকাশে মেঘ জমতে থাকলে তাপমাত্রার সঙ্গে আর্দ্রতার সংযোগ ঘটে। ফলে এক ধরনের ভ্যাপসা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

**আর্দ্রতা ঃ**

বাংলাদেশে প্রায় সারা বছর জুড়েই উচ্চ আর্দ্রতা বিরাজমান থাকে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে মার্চ-এপ্রিল মাসে সর্বাপেক্ষা কম আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়। মার্চ মাসে দিনাজপুরে সর্বনিম্ন গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহে নিম্নতম আর্দ্র মাসগুলি হচ্ছে জানুয়ারী থেকে মার্চ। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে দেশের সর্বত্র আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০% এর অধিক থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে আর্দ্রতা চরমে পৌছে, এসময় বৃষ্টিপূর্ণ দিনের সংখ্যাও বেশি হয় না। ভ্যাপসা গরম আবহাওয়ায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।



Scanned by CamScanner

**মেঘ ঃ**

বাংলাদেশে মেঘাচ্ছন্নতার ধরন দুই বিপরীত ঋতু শীত ও গ্রীষ্মে বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। শীতকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহের ফলে মেঘাচ্ছন্নতা থাকে সর্বনিম্ন। শীতঋতু অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্নতার মাত্রা খুবই ব্যাপক হয়। বর্ষাঋতুর মাঝামাঝিতে জুলাই ও আগস্ট মাসে দেশের সর্বত্র ৭৫% থেকে ৯০% মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বিদ্যমান থাকে। বর্ষাকাল শেষে মেঘাচ্ছন্নতা দ্রুত হ্রাস পায়।

**বৃষ্টিপাত ঃ**

বাংলাদেশের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করে বৃষ্টিপাত। ক্রান্তীয় মৌসুমি অঞ্চলে অবস্থানের কারণে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত সংগটিত হয়ে থাকে। শীতকাল বৃষ্টিহীন ঋতু এবং ডিসেম্বর শুষ্কতম মাস। ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর প্রভাবে কিছু বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। শীতকাল পার হয়ে প্রাক-মৌসুমি গ্রীষ্মঋতুর আগমন ঘটতে থাকলে ভূ-পৃষ্ঠের প্রচন্ড উত্তাপ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসা প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতার কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বজ্রবিদ্যুৎসহ ধ্বংসাত্মক কাল বৈশাখী ঝড়।

বঙ্গোপসাগর থেকে আগত গ্রীষ্মমন্ডলীয় নিম্নচাপসমূহ বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে। দেশের পূর্বাঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৭০%, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ৮০% এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৮৫% এর সামান্য বেশি বর্ষা কালেই সংঘটিত হয়ে থাকে। সিলেট জেলার উত্তরাংশে এবং দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বিশেষ করে কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

**জলবায়ু অঞ্চল ঃ**

তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুচাপ ও আর্দ্রতার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত বাংলাদেশের জলবায়ুকে যে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে সেগুলি হচ্ছে ঃ-

১। ক্রান্তীয় – উপক্রান্তীয় শুষ্কপ্রায় ;
২। ক্রান্তীয় – উপক্রান্তীয় আর্দ্রপ্রায় ;
৩। ক্রান্তীয় – উপক্রান্তীয় আদ্র ;
৪। ক্রান্তীয় – সামুদ্রিক ;
৫। ক্রান্তীয় – বৃষ্টিবহুল : এবং
৬। উপক্রান্তীয় – বৃষ্টিবহুল।

খুলনার পশ্চিম-উত্তরস্থ কিছু এলাকা, যশোর-কুষ্টিয়ার পশ্চিম ভাগের অধিকাংশ, রাজশাহী ও দিনাজপুরের পশ্চিমাংশের বেশ কিছু এলাকা ক্রান্তীয়-উপক্রান্তীয় শুষ্কপ্রায় জলবায়ু অন্তর্গত। বাংলাদেশের এ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা উষ্ণ এবং শুষ্ক। কোনো কোনো সময় মে মাসের তাপমাত্রা ৪৩° সে. অতিক্রম করে যায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণভাবে ১৪০০ মিলিমিটারের কম।

সুন্দরবন এলাকা ব্যতিত খুলনা, বরিশালের পশ্চিমাংশ, পশ্চিম ও পূর্ব দিকের কিছু অংশ বাদে যশোর, শুষ্কপ্রায় এলাকা ব্যতিত কুষ্টিয়া-রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া এবং দিনাজপুরের পশ্চিম-দক্ষিনস্থ উল্লেখযোগ্য অংশকে ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় আর্দ্রপ্রায় জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০০ থেকে ১৭০০ মিলিমিটারের মধ্যে।

বাংলাদেশে ক্রান্তীয়-উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের বিস্তৃতি সর্বাধিক। ক্রান্তীয়-উপক্রান্তীয় আর্দ্রপ্রায় জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত অংশটুকু বাদে বরিশাল, নোয়াখালীর উত্তর-পশ্চিমাংশ, কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, টাংগাইল, উত্তর পূর্বাংশ বাদে ময়মনসিংহ, জামালপুর, রংপুর এবং দিনাজপুরের পূর্বাংশ ক্রান্তীয়-উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ুর অন্তর্গত। এ অঞ্চলের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮০০ থেকে ২৫০০ মিলিমিটার।

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল ক্রান্তীয় সামুদ্রিক জলবায়ু অন্তর্গত। তাপমাত্রার ব্যবধান অধিক নয়। খুব কম ক্ষেত্রেই বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২° সেলসিয়াস ওঠে এবং সর্বনিম্ন ১৩° সে.। বৃষ্টিপাত গড়ে ২৫০০ মিলিমিটার। উপকূলবর্তী এলাকা ব্যতিত চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুর অঞ্চল। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা প্রায় ৩৮° সে.। বৃষ্টিপাত গড়ে ২৬০০ মিলিমিটার।

দিনাজপুরের রূহীয়া, তেঁতুলিয়া ময়মনসিংহের উত্তর পূর্বাংশ এবং সিলেট উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল। খুব কম ক্ষেত্রেই বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৩০° সে, এর ওপরে উঠে। কোন কোন সময় ১০° সে.-এর নিচেও নেমে যায়। বাংলাদেশের মধ্যে এ অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা বৃষ্টি বহুল। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩৪০০ থেকে ৪৬০০ মিলিমিটার। সিলেটের উত্তর-পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত ৫৮০০ মিলিমিটার সমবর্ষণ রেখা অতিক্রম করে যায়।

**বদ্বীপ এবং বাংলাদেশ ঃ**

বদ্বীপ (Delta) হচ্ছে নদীর মোহনার কর্দম, পলি ও বালির সঞ্চয়ন, যার আকৃতি মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের মতো। মোহনায় নদীর স্রোতের বেগ এতই হ্রাস পায় যে, নদীবাহিত তলানী আর পরিবাহিত হতে না পেরে নদীর মোহনায় সঞ্চিত হয় এবং চর জেগে ওঠার ফলে নদীস্রোত বাধাগ্রস্ত হয়ে চরের দুই পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এতে চরের দুই প্রান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ত্রিকোণাকার আকৃতি প্রাপ্ত হয়। তবে যদি উপকূল ঢালু হয়ে নেমে যায় অথবা নদীবাহিত তলানীকে বাধা প্রদান করার জন্য সমুদ্রস্রোত পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন না হয় তবে কোন বদ্বীপ গঠিত হতে পারে না। বদ্বীপ গঠনকালে প্রথমে মোটা পলিকনা এবং পরে সূক্ষ্ম কণাসমূহ স্থির হয়। এই জটিল প্রক্রিয়ার বদ্বীপ গঠনকালে প্রধান নদীখাত, একাধিক নদীখাত, শাখানদী, বিচ্ছিন্ন উপহ্রদ, জলাভূমি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারার সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্কে বিভক্ত হয়। অধিকাংশ বদ্বীপ জটিল এবং বহুমাত্রিক, তবে একটি সাধারণ বদ্বীপে তিনটি প্রধান ধরনের স্তর চিহ্নিত করা যায় :

ক) তলদেশীয় স্তর;
খ) সম্মুখদেশীয় স্তর এবং
গ) পৃষ্ঠদেশীয় স্তর

সাধারণ বদ্বীপের আকৃতি গ্রিক অক্ষর ডেল্টা বা বাংলার মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের মতো হলেও পূর্ণ আকৃতি ও আকারের বদ্বীপও দেখা যায়।

দুটি হিমালয়ী নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সম্মিলিত স্রোতধারায় বিশ্বের যে কোন নদী-ব্যবস্থার তুলনায় সবচেয়ে বেশি অধঃক্ষেপ বঙ্গোপসাগরে এনে ফেলছে। এই দুই নদী অপর অহিমালয়ী নদী মেঘনার সহযোগে বিশ্বের সর্ববৃহৎ যে বদ্বীপটির সৃষ্টি করেছে, সেটি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ বা বঙ্গীয় বদ্বীপ নামে পরিচিত। গঙ্গানদী তার উত্তর পূর্ব মুখী যাত্রায় কয়েকটি বদ্বীপের সৃষ্টি করে পরে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে বর্তমান অবস্থান গ্রহণ করেছে। জেমস রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ ছিল পূর্বমুখী যা ময়মনসিংহের কাছে আদি ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ গঠন করেছিল। বর্তমানে এই নদের গতিপথটি সোজা দক্ষিণমুখী। অবশ্যপূর্বে এই দুটি নদী আলাদা আলাদা ভাবে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো, বর্তমান গঠনে এরা পরিশেষে সম্মিলিতভাবে সাগরে মিলিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূ-খন্ড এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কিছু ভূ-খন্ডে বিস্তৃত বঙ্গীয় বদ্বীপ ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত। পুরাতন এবং নবীন বদ্বীপীয় সমভূমিসহ বাংলাদেশের ৬৫ ভাগ ভূখন্ড জুড়ে রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩৫ ভাগ ভূখন্ড প্লাবন সমভূমি এবং পাহাড়ি ভূমি দ্বারা গঠিত। বঙ্গীয় বদ্বীপ পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতি অঞ্চলসমূহের মধ্যে একটি।

গঙ্গা এবং পদ্মা নদীর প্রবাহ বরাবর অঞ্চল পৃথক করলে দক্ষিণ-পূর্বে যে ভূ-প্রকৃতি অবশিষ্ট থাকে তাকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র (যমুনা)-মেঘনা বদ্বীপ বলে আখ্যায়িত করা হয়। বঙ্গীয় বদ্বীপকে মৃতপ্রায়, অপরিণত, পরিণত এবং সক্রিয় বদ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে গঙ্গা নদীর দক্ষিণে মৃতপ্রায় বদ্বীপের অবস্থান, যেখানে উপনদী সমূহ অত্যধিক পলিভরাটের শিকার এবং নদ নদীর গতিপথ আবদ্ধ হয়ে অসংখ্য অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। যশোর, কুষ্টিয়া এবং ফরিদপুর মৃতপ্রায় বদ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত। মৃতপ্রায় বদ্বীপের দক্ষিণে অপরিণত বদ্বীপ অবস্থিত। এই এলাকা প্রধানত সমুদ্রতট এবং জোয়ার ভাটা প্রভাবিত ভূমি নিয়ে গঠিত। অপরিণত বদ্বীপ জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। এই বদ্বীপের ভূ অবনমনের মাত্রা অধিক। দক্ষিণবঙ্গের কেন্দ্র ভাগ জুড়ে পরিণত বদ্বীপ অবস্থিত। পটুয়াখালি, বরগুনা, প্রভৃতি এলাকা পরিণত বদ্বীপের অন্তর্ভূক্ত যেখানে এলাকা সমূহ ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এবং জোয়ার ভাটার প্রভাবের দিক থেকে পার্থক্য প্রদর্শন করে থাকে। মেঘনা নদীর মোহনা জুড়ে প্রধানত বদ্বীপের সক্রিয় অংশের অবস্থান। ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চলে এখনো বদ্বীপ গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। নিয়মিত প্লাবন, এবং চর ও উপকূলবর্তী দ্বীপ সক্রিয় বদ্বীপের বৈশিষ্ট্য।

**অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব ঃ**

একটি দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী তার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর। ফলে অল্প আয়াসে ফসল উৎপন্ন করা যায়। তাই দেখা যায় শ্রমশক্তির সবচেয়ে বড় অংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির বাংলাদেশের মূল জনসংখ্যার ৮৬ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দক্ষিণের সমুদ্র থেকে উৎপন্ন আর্দ্র মৌসুমি বায়ু উত্তরের হিমালয় পর্বতে বাধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপন্ন করা হয়। ফলে এদেশে ধান, গম, ভুট্টা, ছোলা, মুগ, মসুর ইত্যাদি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। দেশের উত্তরাঞ্চল ধান ও গম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। আবার জাগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায় বলে রংপুর, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি চা উৎপাদনের উপযোগী। এর কারণ, পাহাড়ি ঢাল ও প্রচুর বৃষ্টিপাত।

দেশের অভ্যন্তরীণ জলভাগ যেমন নদী-নালা, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি থেকে প্রচুর মৎস্য সম্পদ আহরিত হয়। আবার বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর লোনা পানির মাছ পাওয়া যায়। পশু খাদ্যের প্রয়োজনের কারণে গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি পালিত হয়। মৎস্য ও পশু সম্পদ লালন-পালনের মাধ্যমে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বনভূমি, মধুপুর ও ভাওয়াল-এর বনভূমি এবং বরেন্দ অঞ্চলের বনভূমিতে রয়েছে প্রচুর বনজ সম্পদ। এসব বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অনেকের জীবিকার প্রয়োজন মেটে।



Scanned by CamScanner

উত্তরাঞ্চলে প্রচুর আখ চাষ হয় বলে চিনিকলগুলো উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। আবার দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল গ্যাস সমৃদ্ধ বলে পাটকল, বস্ত্রকল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও অন্যান্য শিল্প ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হয়। দেশের উঁচু ও শক্ত মাটির এলাকায় রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে সমৃদ্ধ নৌ পথ। সড়ক, রেল ও নৌপথে যানবাহন পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিকাশ ঘটে।

**মানুষের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব ঃ**

দেশের উত্তরাঞ্চল কৃষি কাজে সমৃদ্ধ বলে সেখানে দেশান্তরের হার, বিশেষত বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণের পূর্বে খুব কম ছিল। অবশ্য বর্তমানে রাজধানীসহ অন্যান্য দেশেও বহির্গমনের প্রবণতা বেড়েছে। পক্ষান্তরে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অনুন্নত কৃষি, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি কারণে স্থানান্তরের হার খুব বেশি ছিল। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ'র 'লালসালু' উপন্যাসে দেখা যায় দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ দেশের বিভিন্ন স্থানে জীবিকার প্রয়োজনে ছড়িয়ে পড়তো। এমন কি দেশান্তরের হারও ছিল খুব বেশি।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক বলে বাংলার লোক সঙ্গীতে ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক দেশের জাতীয় চরিত্র যেমন প্রধানত তার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, তেমনি লোকসঙ্গীতও প্রধানত দেশের প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশের প্রকৃতি সকল অঞ্চলে এক নয়- কোথাও নদ-নদী বিধৌত, কোথাও অরণ্যকীর্ণ, আবার কোথাও বা চরাই অঞ্চল। এসব কারণে লোকসঙ্গীতের সুর সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করলেও তা সুখ্যাত আঞ্চলিক হিসেবে। যেমন- উত্তর বঙ্গের ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, পূর্বাঞ্চলের ভাটিয়ালি, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বাউল-মারফতি ইত্যাদি।

উপজাতীয় সংস্কৃতি অধিক মাত্রায় রক্ষণশীল, পরিবর্তন বিমুখ ও ঐতিহ্যপন্থী। বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের অপরিবর্তনীয় অর্থনীতি ও অন্তর্মুখী মানসিকতার কারণে যেখান থেকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিল, বর্তমানেও প্রায় সেখানেই রয়ে গেছে। তবে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, সাহসী, পরিশ্রমী, উৎসাহী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকে। পার্বত্য পরিবেশ তাদের দেহ, মন ও চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আবার অল্প পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করা যায় বলে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অলস প্রকৃতির ও শ্রম বিমুখ হয়ে থাকে। তবে জীবিকা নির্বাহের জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে হয় না বলে এখানকার অধিবাসীরা সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদিন চর্চা করার অধিক সময় পান।

এদেশের ভূ-প্রকৃতি, নদীমালা, জলবায়ু ইত্যাদি মানুষের আবেগ ও অনুভূতিতেও প্রভাব ফেলে। নদীর পালতোলা নৌকা, পড়ন্ত বিকেলের সোনা -রোদের আলোতে নদীর তীরবর্তী কোন এক বটবৃক্ষের তলায় বসা গ্রামীণ হাটের কোলাহল কিংবা গোধূলি লগ্নে নদীর তীর ধরে পরিশ্রান্ত কৃষকের গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফেরার দৃশ্য অথবা চাঁদনী রাতের স্নিগ্ধ আলোয় নৌকা বেয়ে যাওয়া মাঝির দরাজ গলায় ভাটিয়ালি গানের সুর- সবকিছু আমাদের বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতিরই প্রাণ হয়ে আছে। সেই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যেই স্বাধীন সত্তায় সমুজ্জ্বল এ দেশ।

## Teacher Work বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদী

বাংলাদেশের নদীমালা এর গর্ব। এখানে প্রায় ৭০০টি নদী-উপনদী সমন্বয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নদ্-নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কি. মি.। ছোট ছোট পাহাড়ি ছড়া, আঁকাবাঁকা মৌসুমি খাড়ি, কর্দমপূর্ণ খাল-বিল, যথার্থ দৃষ্টি নন্দন নদ-নদী ও এদের উপনদী এবং শাখানদী সমন্বয়ে বাংলাদেশের বিশাল নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু স্থানে যেমন : পটুয়াখালি, বরিশাল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে নদীমালা এতই বেশি যে সে অঞ্চলে প্রকৃতই নদীজালিকার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের নদী নালাগুলো স্বাভাবিক ভাবেই দেশের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। দেশের উত্তর ভাগের উত্তর- পশ্চিম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভাগের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে নদ-নদীর সংখ্যা এবং তার আকার দুইই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই কেউ কেউ বলেন, অসংখ্য শিরা-উপশিরা-ধমনী যেমন মানবদেহে প্রবাহিত হয়ে মানুষকে সচল করে রাখে, তেমনি বাংলাদেশের নদীগুলো ও দেশটাকে সজীব রেখে চিরসবুজের দেশে পরিণত করে রেখেছে। এ নদীগুলোর উপরই নির্ভর করছে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল এবং মানুষের জীবন ও জীবিকা। এদেশের উর্বর ভূমি আকর্ষণ করেছে আর্য, দ্রাবিড়, মোগল, পাঠান, তুর্কি, আরব, ইংরেজ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে। ফলে এখানে সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

নদী মাতৃক এদেশের আর্থ-সামাজিক ও জীবন-জীবিকায় নদীর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদী এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল বাহক। যুগে যুগে এ নদীগুলো গড়ে তুলেছে জনপদ এবং ব্যবসায়িক ও শিল্প কর্মের কেন্দ্রবিন্দু, এনেছে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-হাজার বছরের নদীতে বয়ে যাওয়া পানি দ্বারা এ ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভূমিকে মানুষ তার আবাসস্থলে পরিণত করেছে। দেশে শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে থাকা নদী দেশকে করেছে শস্য-শ্যামল। এসব নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জীবিকা, পরিবহন, কৃষ্টি, শিল্প, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো –



Scanned by CamScanner

**ক) নদী ও কৃষি ঃ**

নদীতে পানি প্রবাহ যখন বেশি থাকে তখন তার সাথে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিকারী পলি ও প্রবাহিত হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বছরে নদীবাহিত পলির পরিমাণ ২ থেকে ৪ বিলিয়ন টন। বন্যার সময় সন্নিহিত জমিতে পলি জমে ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া কৃষি প্রধান বাংলাদেশের চাষাবাদ অনেকাংশে নদী-নালার পানির উপর নির্ভরশীল। আমন ধান কাটার পর নভেম্বর মাসের মাঝমাঝি সময়ে বীজতলা তৈরি করে ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান রোপন করা হয়। বোরো মৌসুমে বৃষ্টিপাত তেমন হয়না বলে নদীর পানি দিয়ে সেচ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদী বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা দেশের কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। খাদ্যশস্য উৎপাদন করা ছাড়াও অর্থকরী ফসল যেমন পাট উৎপাদনেও নদীর ভূমিকা রয়েছে। নদী বা নদী বাহিত পানিতে পাট জাগ দিয়ে আঁশ ছাড়ানো হয়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওর ও পুকুর। তার দক্ষিণে অন্তহীন সমুদ্র। মৎস্য উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে আছে এ দেশের সর্বত্র যার মধ্যে নদী অন্যতম। এতে পাওয়া যায় অসংখ্য প্রজাতির মাছ। এসব মাছ সুস্বাদু ও সহজ পাচ্য। মাছ তাই বাঙালিদের কাছে অতি প্রিয়। এদেশে মাছের উৎপাদন ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩৫.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন- যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই আহরিত মাছের পরিমাণ ২৯.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য মোচনে এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি দূরীকরণে মৎস্য খাত পালন করে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যার মধ্যে নদীর ভূমিকা অন্যতম।

**খ) নদী ও শিল্প ঃ**

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় এবং পাকিস্তানি আমলে পূর্ব বাংলায় পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। এসব শিল্প কারখানার অধিকাংশই গড়ে উঠেছে নদী তীরবর্তী এলাকায়। নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অনেক পাটকল গড়ে উঠেছিল বলে নারাণগঞ্জকে প্রাচ্যের 'ড্যান্ডি' বলা হতো। বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটি শিল্প। বিশেষত গার্মেন্টস শিল্পের Back word Linkage দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এ শিল্পের বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে প্রধানত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের নদী তীরবর্তী এলাকায় বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ কৃষি ভিত্তিক দেশ হওয়ায় সারের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। নদীপথে সার সরবরাহ সুবিধাজনক হওয়ায় ছাতক, ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ ইত্যাদি নদী তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপক হারে সার কারখানা গড়ে উঠেছে। এছাড়া সিমেন্ট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আমদনিকৃত কাঁচামাল এবং উৎপন্ন দ্রব্য নৌপথে পরিবহন সুবিধাজনক বিধায় সুরমা, শীতলক্ষ্যা ইত্যাদি নদীর তীরবর্তী এলাকায় সিমেন্ট শিল্প গড়ে উঠেছে। এক কথায় বাংলাদেশের শিল্পায়নে নদী অন্যতম প্রধান ভৌগোলিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

**গ) পরিবহন ও যাতায়াত ঃ**

নৌপথ এদেশে অন্যতম যাতায়াতের উপায়। বাংলাদেশে প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারা বছর নৌ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌচলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। তাই গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দরগুলো এ অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি ও খুলনা অন্যতম। অন্যান্য নদীবন্দরের মধ্যে ভৈরব বাজার, আশুগঞ্জ, আরিচা ও সিরাজগঞ্জের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বহির্বিশ্বের সাথে আমদানি রপ্তানির জন্য দেশের প্রধানতম চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কর্ণফুলি নদীর মোহনা অবস্থিত। দেশের অপর সমুদ্রবন্দর মংলা পশুর ও মংলা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম নৌপথ। কারণ নৌপথ প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় অধিক সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। এখনও এদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতি টন মালামাল পরিবহনে প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় হয় ০.৯০ টাকা, আর সে অনুযায়ী সড়ক ও রেলপথে ব্যয় হয় যথাক্রমে ২.২২ টাকা এবং ২.০০ টাকা । আবার নৌপথ সড়ক ও রেলপথের তুলনায় জ্বালানি সাশ্রয়ী। এছাড়া প্রতি কিলোমিটার সড়কপদ ও রেলপথ সংরক্ষণ ব্যয় যথাক্রমে ৬ লাখ ও ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং সেই তুলনায় প্রতি কিলোমিটার নৌপথের সংরক্ষণ ব্যয় মাত্র ১ লাখ টাকা।



Scanned by CamScanner

**ঘ) নগরায়ণ :**

নগরায়ণ বলতে একটি নগর, তার বাসিন্দাদের চিন্তা-ভাবনা, পারস্পরিক আচরণ প্রভৃতির উপর অর্থাৎ নগরীর জীবন যাত্রার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঘটনাকে বুঝায়। ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলার প্রাচীনতম নগর পুন্ড্রনগর করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। সুবাদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ সালে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরবর্তী ঢাকাকে বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। ব্রিটিশরা হুগলি নদীর তীরবর্তী কলকাতাকে ভারতের রাজধানী নির্বাচিত করেন। এছাড়া দেশের অন্যান্য প্রায় সব নগর নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। যেমন চট্টগ্রাম কর্ণফুলি নদীর তীরে, রাজশাহী পদ্মা নদীর তীরে, খুলনা রূপসা নদীর তীরে এবং সিলেট সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। এক কথায় নদী নগরায়ণের অন্যতম প্রধান নিয়ামক।

বাংলাদেশের নদীগুলো কৃষি ও শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে GDP-তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নগরায়ণের মাধ্যমে সেবাখাতের প্রবৃদ্ধি ঘটায়। মোট কথা দেশের অর্থনীতির সব খাত নদীর উপর নির্ভরশীল। নদী-দূষণ বা নদী দখলের ফলে গোটা বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই নদীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে সরকার ও জনসাধারণের সচেতন হওয়া উচিত।

## Teacher Work

## বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিবরণ

### বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, অবস্থান, আয়তন ও সীমা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এদেশ ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১' থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭, ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার (ছিটমহলগুলো যুক্ত হওয়ার ফলে বর্তমানে আয়তন দাড়িয়েছে ১,৪৭,৬১০ বর্গ কি.মি.)। এর পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ; উত্তরে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মিয়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মোট সীমানা ৫১৩৮ কিলোমিটার যার মধ্যে স্থল সীমা ৪৪২৭ কিলোমিটার এবং জল সীমা ৭১১ কিলোমিটার (মাধ্যমিক ভূগোলের সূত্র অনুযায়ী- মোট সীমানা ৪৭১২ কি.মি. প্রায়, যার মধ্যে স্থল সীমা ৩৯৯৫ কি.মি. এবং জল সীমা ৭১৬ কি.মি. প্রায়)। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে ২৭১ কি.মি. (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল। মহী সোপান ৩৫০ নটিক্যাল মাইল।

**ভূ-প্রকৃতি :**

বাংলাদেশ পলল গঠিত একটি আর্দ্র অঞ্চল। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড মূলত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীগঠিত সুবৃহৎ বদ্বীপের সমন্বয়ে সৃষ্ট। বঙ্গীয় বদ্বীপ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপগুলোর একটি। বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় অর্ধেক অংশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা এই তিনটি বৃহৎ নদীপ্রণালীর সর্বনিম্ন ভাটিতে অবস্থিত এবং গড় উচ্চতা ৯ মিটার। উচ্চতা ও ভূমিরূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় –

১. টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ
২. প্লাইস্টোসিন কালের সোপান সমূহ
৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল

নিচে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল –

**১. টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ :**

মধ্যে ম্যায়োসিন যুগ থেকে শুরু করে টারশিয়ারী যুগের শেষ পর্যন্ত সময়কালে গিরিজনী আলোড়নের ফলে আরাকান, লুসাই ও গারো পাহাড় উত্থিত হয়েছিল। বাংলাদেশে অবস্থিত চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভী বাজার ও কুমিল্লার পাহাড় উপরোক্ত পাহাড়ের অংশ বিশেষ। পাহাড়গুলো ভঙ্গিল। বেলেপাথর, শ্লেট পাথর এবং কাদা দিয়ে তৈরি, এ দেশের পাহাড়গুলোকে অঞ্চল ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

ক. উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পাহাড়
খ. দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়



Scanned by CamScanner

**ক. উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পাহাড় :**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ও সুনামগঞ্জ জেলার পাহাড়গুলো এ অঞ্চলের অন্তর্গত। ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরে সুসং নামক পাহাড়ি এলাকা রয়েছে। এসব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া, জয়ন্তিকা ও গারো পাহাড়ের অংশ বিশেষ। বাংলাদেশে এগুলোর যেটুকু অংশ রয়েছে, এদের উচ্চতাও খুব কম। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এগুলোর উচ্চতা ৬১ থেকে ৯১ মিটার।

**খ. দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড় :** রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। পাহাড়গুলো উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা গুলো প্রায় ক্ষেত্রেই নদী উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বের এ পাহাড় গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। ১,২৩০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট শৃঙ্গ কিওক্রাডং, এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। সাম্প্রতিক কালে বান্দরবানে আরো একটি শৃঙ্গ আকিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম তাজিওজং (বিজয়) এবং উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এটিই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

টারশিয়ারী যুগে সৃষ্ট পাহাড়গুলো চিরহরিৎ বনে আবৃত। অঞ্চলগুলো কৃষিকাজে অনুন্নত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকীর্ণ উপত্যকাগুলোর জঙ্গল কেটে জুম পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। চট্টগ্রামে কিছু চা জন্মে। সিলেটের পাহাড়ে ও টিলার ঢালে প্রচুর চায়ের বাগান রয়েছে। উচ্চতার কারণে পাহাড়ি এলাকার নদীগুলো খরস্রোতা। ফলে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

**২. প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ :**

আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিন কাল বলা হয়। উত্তর পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় এ অঞ্চরের অন্তর্গত। সোপানগুলোর গড় উচ্চতা ১০ থেকে ১৮ মিটার। বন্যার সময় এসব অঞ্চল নিমজ্জিত হয় না।

**ক. বরেন্দ্রভূমি:**

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অঞ্চলে প্লাইস্টোসিন যুগের সর্ববৃহৎ চত্বর হলো বরেন্দভূমি। দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুরের অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। বাংলাদেশের এই অঞ্চলের আয়তন ৯,৩২০ বর্গ কিলোমিটার। এর পূর্বে করতোয়া ও পশ্চিমে মহানন্দা নদী অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চলটিকে পুনর্ভবা, আত্রাই ও ছোট যমুনা নদী চারটি অংশে বিভক্ত করেছে। এগুলোর পশ্চিমের অংশটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের মাটি প্রাচীন পলল দিয়ে গঠিত। এর বহু অংশ তরঙ্গায়িত। এগুলো দেখতে গম্বুজাকার এবং এগুলোর উপরিভাগ প্লাবন ভূমি থেকে ৬-১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট স্রোতস্বিনী রয়েছে- যা খাত বিশিষ্ট এবং আঁকাবাঁকা গতিসম্পন্ন। এই গভীর স্রোতস্বিনীগুলো 'খাড়ি' নামে অভিহিত। এ অঞ্চলের মাটি লালচে ও ধূসর এবং স্থানে স্থানে কঙ্করযুক্ত হওয়ায় কৃষিকাজের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুন্নত। নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নতুন পলি সঞ্চিত হয় না। ফলে এ অঞ্চলের মাটির উর্বরাশক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। প্রধান খাদ্য শস্য ধান ছাড়াও পাট, ভুট্টা ও পান উৎপাদন করা হয়।

**খ. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় :**

এই অঞ্চল উত্তরে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে শুরু করে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি প্লাটস্টোসিন যুগের দ্বিতীয় বৃহত্তম চত্বর, প্রকৃতপক্ষে এটি উত্থিত ভূমি। এর পূর্বের ও দক্ষিনাংশের উচ্চতা ৬ মিটার এবং পশ্চিম দিকের উচ্চতা ৩০ মিটার। এর প্রান্ত ভাগগুলো চ্যুতির সমন্বয়ে গঠিত। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত গড়ের উত্তরাংশ 'মধুপুর' এবং গাজীপুর জেলায় অবস্থিত গড়ের দক্ষিণাংশ 'ভাওয়াল' নামে পরিচিত। ভাওয়াল ও মধুপুর গড়ের মোট আয়তন ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। মাটির রঙ লাল এবং কঙ্করময়। কৃষি কাজের অনুপুযুক্ত। পানিসেচের মাধ্যমে সবজি, আনারস ও ধানের চাষ করা হয়। এই চত্বরভূমিতে পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান বৃক্ষ গজারি। চত্বর ভূমির মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা নদী প্রবাহিত হয়েছে। বংশী, বালু উল্লেখযোগ্য নদী।

**গ. লালমাই পাহাড় :**

কুমিল্লা শহরের ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে ময়নামতি এলাকায় লালমাই পাহাড় অবস্থিত, ৩৪ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই এলাকাটি প্রকৃতপক্ষে দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী হোস্ট নামক উন্নত ভূ-ভাগ। এলাকার গড় উচ্চতা ২১ মিটার। কোন কোন স্থানের উচ্চতা ৪৬ মিটার পর্যন্ত। লালমাটি, বালি ও নুড়ি পাথরের সমন্বয়ে গঠিত এই এলাকার পূর্বাংশ অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত। পাহাড়ের পাদদেশের সমতল ভূমিতে আলু তরমুজ ইত্যাদি চাষ করা হয়। বিক্ষিপ্ত কিছু পত্র পতনশীল বৃক্ষ দেখা যায়।

**৩. সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি :**

টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। অসংখ্য ছোট বড় নদী বাংলাদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সমভূমির ওপর দিয়ে এ নদীগুলো প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। এ সমভূমি বাংলাদেশের উত্তর অংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন। সাম্প্রতিক কালের সমভূমি নিম্নলিখিত ৭ ভাগে বিভক্ত :



Scanned by CamScanner

**ক) পুরাতন পলল ও পাদদেশীয় সমভূমি (হিমালয়ের পাদদেশের সমভূমি) :**

হিমালয় পর্বত থেকে আসা পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা জেলায় পাদদেশীয় পলল সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে। তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই বিধৌত এই অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ মিটার উঁচু। এ অঞ্চলের প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য ধান, পাট, ইক্ষু ও তামাক।

**খ) সাম্প্রতিক প্লাবনভূমি (বন্যা প্লাবিত সমভূমি অঞ্চল) :**

ভাওয়াল ও মধুপুরের চত্বর এবং বরেন্দ্রভূমি ছাড়া পদ্মা নদীর উত্তরের নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলার মধ্যাংশ, সিরাজগঞ্জ জেলা, বগুড়ার পূর্বাংশ, জামালপুর জেলা, গাজীপুর জেলার দক্ষিণাংশ, নরসিংদি, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ জেলার উত্তরাংশ, ঢাকা জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ স্থান নিয়ে পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার প্লাবন সমভূমি গঠিত, বাংলাদেশের মূল প্লাবন ভূমি বলতে এই অঞ্চলকেই বুঝায়। প্রতি বছর এ অঞ্চল বর্ষাকালে বন্যায় প্লাবিত হয়।

**গ) কুমিল্লার সমভূমি :**

কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ এবং নোয়াখালি ও সিলেট জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে বিস্তৃত এই নিচু সমভূমি অঞ্চলটি কুমিল্লার (ত্রিপুরা) সমভূমি নামে পরিচিত। সমগ্র অঞ্চলটি এর আশেপাশের সমভূমি থেকে কিছু উঁচু। এ অঞ্চলের নদীগুলো সর্পিল গতি সম্পন্ন এবং নদীখাত বেশি গভীর নয়। নদীগুলোর আশেপাশে বহু অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। মাটি উর্বর। ধান, পাট ও অন্যান্য ফসল জন্মে।

**ঘ) সিলেট অববহিকা :**

সিলেট জেলার অধিকাংশ এলাকা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার সামান্য অংশ নিয়ে সিলেট অববাহিকা গঠিত। এ অববাহিকাটি ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে অবনমিত এবং সমভূমি অঞ্চল থেকে এটি নীচু। সমৃদ্ধ পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩ মিটার। বর্ষাকালে প্রতি বছর সমগ্র অঞ্চলটি প্লাবিত হয়ে যায়। এর দক্ষিণাংশে কয়েকটি হাওড় রয়েছে।

**ঙ) উপকূলীয় বদ্বীপ অঞ্চল :**

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সমভূমিকে উপকূলীয় বদ্বীপ অঞ্চল বলা হয়। নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, মানিকগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশ ও মুন্সীগঞ্জ জেলাসহ পদ্মা নদীর সমগ্র দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। পদ্মার বিভিন্ন শাখা নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উপকূলী বদ্বীপ অঞ্চলকে চারটি অংশে ভাগ করা যায় –

**i) সক্রিয় বদ্বীপ :**

পূর্বে মেঘনার মোহনা থেকে পশ্চিমে গড়াই ও মধুমতি নদীর উৎসস্থল পর্যন্ত উপকূলীয় বদ্বীপের পূর্বাংশ সক্রিয় বদ্বীপের অন্তর্গত। বর্ষাকালে সমগ্র অঞ্চলটি প্লাবিত হয়ে যায়। বরিশাল, পটুয়াখালি, গোপালগঞ্জ, মাদারিপুরে প্রচুর অগভীর জলাশয় রয়েছে। এসব বিলে প্রতি বছর প্রচুর পলি সঞ্চয়ের ফলে নতুন করে বদ্বীপ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও মেঘনার মোহনায় নতুন নতুন বদ্বীপ গড়ে উঠেছে। এসব দীপের কোনটি সমুদ্র পৃষ্ঠের সমান উচ্চতায় রয়েছে, কোনটি নিমজ্জিত রয়েছে। প্রতি বছর নতুন পলি সঞ্চয়ের কারণে সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের মাটি খুব উর্বর। ধান, পাট, ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হয়। শীতকালে বোরো ও ইরি ধান উৎপন্ন হয়। বিদল গুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

**ii) মৃত প্রায় বদ্বীপ :**

উপকূলীয় বদ্বীপ অঞ্চলের পশ্চিম অংশ অর্থাৎ কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ও নড়াইলের বেশির ভাগ অঞ্চল মৃতপ্রায় বদ্বীপের অন্তর্গত। শুকনো ঋতুতে এ অঞ্চলের নদীগুলো পদ্মার মূল স্রোতধারা পানির সরবরাহ পায় না, ফলে নদীগুলো নিষ্ক্রিয় থাকে। বেশির ভাগ নদী ভরাট হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। প্রতিবছর প্লাবিত না হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের মাটি অনুর্বর।

**iii) স্রোতজ সমভূমি :**

উপকূলীয় বদ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে যেখানে সমুদ্রের জোয়ার ভাটার প্রভাব দেখা যায়, তাকে স্রোতজ সমভূমি বলে। সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনার দক্ষিণ অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। বহু ছোট ছোট নদী এখানে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। জোয়ার প্লাবন সমভূমির বেশির ভাগ এলাকায় লবণাক্ত মাটির প্রভাবে ম্যানগ্রোভ বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে। এই বনভূমি সুন্দরবন নামে পরিচিত। লবণাক্ততার কারণে মূল বনভূমির পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোতে কৃষিকাজ এত ভালো হয় না। লোকবসতি খুব কম।



Scanned by CamScanner

iv) **পরিণত বদ্বীপ :**

মধুমতি, ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম দিকের ভূমি, মৃতপ্রায় বদ্বীপ এবং স্রোতজ সমভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চল পরিণত বদ্বীপ নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি কপোতাক্ষ ও ভৈরব নদীর পলি সঞ্চয়ের ফলে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এসব নদীর স্রোত কমে গেছে। নিয়মিত প্লাবিত না হওয়ার কারণে এ অঞ্চলে বদ্বীপ গঠনের কাজ এখন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

চ) **উপকূলীয় প্লাবন সমভূমি বা চট্টগ্রামের সমভূমি :**

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সমুদ্র উপকূল জুড়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সংকীর্ণ চট্টগ্রাম সমভূমি অবস্থিত। এটি উত্তরে ফেনী থেকে দক্ষিণে কক্সবাজারের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিলম্বিত। কর্ণফুলী, সাংগু, মাতামুহুরী, বাঁশখালী ইত্যাদি নদী বাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে এখানকার ভূমি গড়ে উঠেছে।

ছ) **মোহনার প্লাবন সমভূমি :**

বাংলাদেশের অনেক নদী বদ্বীপ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। পটুয়াখালি, বরগুনা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার দক্ষিণাংশে বাংলাদেশের মোহনা প্লাবনভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলের ভূমি প্রায় সমতল, পানি নিষ্কাশন প্রণালীগুলোর অধিকাংশই কৃত্রিম ভাবে খনন করা হয়েছে। নোয়াখালীর দক্ষিণে এবং মেঘনা নদীর মোহনার দ্বীপগুলোতে সাম্প্রতিক কালে মোহনা প্লাবনভূমি সম্প্রসারিত হয়ে সাগরবক্ষে নতুন উঁচু ভূমি গঠন করেছে। ক্রমগত ক্ষয় ও সঞ্চয়ের ফলে মেঘনার দ্বীপগুলোর আকার ও অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশের পাহাড়িয়া অঞ্চল ও চতুর অঞ্চল ছাড়া সম্পূর্ণ প্লাবন ভূমিতে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক জলা ভূমি, বিল, হাওড় বাঁওড় রয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা এসব জলাভূমি দুই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় পরিত্যক্ত পুরাতন খাত থেকে কিছু বিলের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কিছু বিল ভূ-আলোড়নের সময় সৃষ্ট চ্যুতি বা অবনমনের ফলে উৎপত্তি লাভ করেছে। বিল, হাওড়, বাঁওড়, ছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বড় বড় দিঘি ও পুকুর রয়েছে।

## Student Work বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

জনসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জনশক্তির পরিমাণ ও গঠন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। আবার সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া জনগণের কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। পক্ষান্তরে জনগণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং কোন দেশের জনসংখ্যা সমস্যা বিবেচনা করতে হলে তা সে দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ, জন্ম ও মৃত্যু হার, জনগণের মানসিক গঠন, জনসংখ্যার বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। নিম্নে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

১. **খাদ্য সমস্যা :**

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৭৯ লাখ এবং তা বার্ষিক শতকরা ১.৩৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এরূপ আধিক্য দেশে খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে প্রতিবছর আমাদেরকে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। যেমন- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশকে প্রায় ৩০ লাখ ৬৪ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়েছে।

২. **মূলধন গঠন :**

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন অপরিহার্য। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে আয় সৃষ্টি হচ্ছে তা আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য ব্যয়িত হওয়ার ফলে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৩. **কৃষি জমির উপর চাপ :**

বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের কৃষি জমির উপর প্রচন্ড চাপ পড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ হল মাত্র ০.২৮ একর এবং দেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কৃষক ভূমিহীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।



Scanned by CamScanner

৪. **বেকার সমস্যা :**

আমাদের দেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত নগণ্য। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। বর্তমানে আমাদের দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেকার রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বেকার সমস্যা ভবিষ্যতে আরও তীব্রতর হবে।

৫. **প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব :**

পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত কর্মস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার মৌল উপাদান। কিন্তু এগুলোর কোনটিই আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। অনেক শিশু অপুষ্টির শিকার, ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা ২১৬৬ জন। ফলে সুষম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে নির্জীব ও কর্মবিমুখ জনগোষ্ঠী আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।

৬. **বর্ধিত জনগোষ্ঠীর ভরণ পোষণ :**

বর্তমানে বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এই বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য বার্ষিক আনুমানিক প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য, ৩ লক্ষ বাসগৃহ, ৮ লক্ষ কর্মসংস্থান এবং ৬০ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সীমিত সম্পদের দ্বারা এরূপ বর্ধিত চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়।

৭. **নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি :**

বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার হার অত্যন্ত বেশি, এদেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬১.৪ জন লোক আছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রায় ৪০ শতাংশ লোক কর্মক্ষম নয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় স্বরূপ।

৮. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল লাভে বাধা :**

বাংলাদেশে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের জনগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধাটুকু বর্ধিত জনগনের ভরণপোষণেই ব্যয় হয়ে যায়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যতই হ্রাস পাবে, ততই অধিক পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করা যাবে।

৯. **শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত :**

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় আমাদের দেশের শিল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ছে। এতে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

১০. **জনগণের মানসিক গঠন :**

আমাদের দেশের জনগণের মানসিক গঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে এখনও পর্যন্ত এতটা সহায়ক নয়। যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিক শোষণের ফলে এদেশের মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমাদের দেশের এখনও গুটি কয়েক শিক্ষিত ও বিত্তশালী লোকের স্বার্থরূপে পরিগণিত হচ্ছে। দেশের আপামর অশিক্ষিত জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতাও নেই, আগ্রহও নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বিপুল জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে দেশের অগ্রযাত্রাকে বিঘ্নিত করছে। এ কারণেই জনসংখ্যা সমস্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।



Scanned by CamScanner

## বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরনের কারণ

জনসংখ্যা সমস্যা বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনুন্নত দেশগুলোতে এই সমস্যা আরো প্রকট। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ-এর দশক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এমন এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, এই জনস্ফীতিকে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশও বর্তমানে এক ভয়াবহ জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ১৪ লক্ষ। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন এবং এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫ অনুযায়ী বর্তমানে ১.৩৬% ধারে বৃদ্ধি পেয়ে তা ১৫ কোটি ৭৯ লাখে দাড়িয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যত বাংলাদেশ এক ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশ একটি ছোট জনপদ। আমাদের সহায় সম্বল খুবই সীমিত। সুতরাং সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশ বর্তমানে এক ভয়াবহ জনসংখ্যা বিস্ফোরেণের সম্মুখীন। নিম্নে বাংলাদেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. **ভৌগোলিক পরিবেশ :**
ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর জনবসতির ঘনত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। বাংলাদেশের মতো সমভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বসবাস করা আরামদায়ক হওয়ায় এখানে লোকবসতির ঘনত্ব বেশি। এছাড়া বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। ক্রান্তীয় অঞ্চলের মেয়েরা অল্প বয়সে সন্তান ধারনে সক্ষম এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতা শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের তুলনায় বেশি থাকে। ফলে এদেশে জন্মের হার অধিক।

২. **চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি :**
বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে রোগ নিবারক ও প্রতিষেধক নানা প্রকার ঔষধ সহজলভ্য হওয়ায় বাংলাদেশে মৃত্যুর হার বেশ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় জন্মহার কমেনি। ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২১ লক্ষ লোক মোট জনসংখ্যার সঙ্গে সংযোজিত হচ্ছে।

৩. **খাদ্যাভ্যাস :**
১৯৬৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর হল্যান্ডের জনসংখ্যা কেন্দ্রে একটি গবেষণায় মত প্রকাশ করা হয় যে, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যে (যেমন-ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি) মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য (যেমন-মাংস, মাছ) গ্রহণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য এবং তারা ক্যালরির শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ ভাত থেকে গ্রহণ করে। বাঙালির খাদ্য তালিকায় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের তুলনায় আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ খুবই কম। ফলে বাংলাদেশে জন্মহার বেশি।

৪. **চরম দারিদ্র্য ঃ**
সাধারণত দেখা যায় যে, দরিদ্র দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। মিস্টার ডি. ক্যাস্টো তাঁর বিখ্যাত 'Geography of Hunger' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক। ১৯৭৬ সালে ইংল্যান্ডের সাসেক্সে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিরাও ডি ক্যাস্টোর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েছেন। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলোতে –
ক) শিক্ষিতের হার কম,
খ) চিত্তবিনোদনের সুযোগের অভাব এবং
গ) সমাজব্যবস্থা অনুন্নত- ইত্যাদি কারণে এই সব দেশে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **নারী শিক্ষার অভাব :**
নারী শিক্ষার হার বেশি হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হয়। এর কারণ –
ক) শিক্ষিতা মহিলাদের পড়াশুনায় অধিক সময় অতিবাহিত হয় বলে সাধারণত তাদের দেরিতে বিয়ে হয়।
খ) শিক্ষিতা কর্মজীবী মহিলাদের ব্যস্ত থাকতে হয় বলে তারা কম সন্তান কামনা করেন।
গ) শিক্ষতা মহিলারা জীবনযাত্রার মান, পরিবারের সুখ-সুবিধা, সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত প্রভৃতি ব্যাপারে সচেতন থাকে বলে তারা ছোট পরিবারে আগ্রহী থাকে।
বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। এটি আমাদের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।



Scanned by CamScanner

৬. **কর্মসংস্থান :**
উন্নত দেশসমূহের শ্রমশক্তির শতকরা ৫০ ভাগই মহিলা। আমাদের শ্রমশক্তিতে মহিলাদের হার খুবই সামান্য। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবে বাংলাদেশের মহিলাদের সমাজিক মর্যাদাও অত্যন্ত কম। সুতরাং তাদের অবদান ও দায়িত্ব প্রধানত সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে এবং সন্তান উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৭. **সামাজিক কাঠামো :**
কৃষি বাংলাদেশের জনগণের প্রধান জীবিকা। কৃষিভিত্তিক সমাজে পুত্রসন্তান পরিবারের অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও সামাজিক প্রতিপত্তির জন্যও পিতা-মাতা অধিক সন্তান কামনা করে। এসব কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সন্তান সংখ্যা অধিক।

৮. **আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি :**
কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৫১ বছর। কিন্তু অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫ অনুযায়ী এটি বৃদ্ধি পেয়ে ৭০.৭ বছরে উন্নীত হয়েছে। আয়ুষ্কালের এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে।

৯. **বাল্য বিবাহ :**
আইনগত বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও এখনও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। এটি আমাদের দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ১৪ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত মেয়েদের অধিক সন্তান হওয়ার সক্ষমতা থাকে। এই বয়সটি পার করে বিয়ে দিলে সন্তানের সংখ্যা কম হয়।

১০. **অনুন্নত জীবনযাত্রার মান :**
আমাদের দেশে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত অনুন্নত। কাজেই সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনের খরচ খুবই কম। সুতরাং অল্প বয়সে বিয়ে করে অধিক সন্তান জন্ম দিতে কারো তেমন আপত্তি থাকেনা।

১১. **প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ :**
ধর্ম-সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে বাংলাদেশের মানুষ অতিমাত্রায় ভাগ্যে বিশ্বাসী। সন্তান না হওয়ার ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে তারা সন্তান লাভের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক ব্যাপার বলে মনে করে। ফলে বাংলাদেশে জন্মহার দিন দিন বাড়ছে।

১২. **বহু বিবাহ :**
প্রচলিত আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগের অভাবে আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনো বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। এটিও আমাদের দেশে অধিক জন্মহারের জন্য দায়ী। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে সম্পন্ন গৃহস্থরা এখনও একাধিক বিবাহ করাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও পৌরুষের প্রতীক বলে মনে করে।

১৩. **জন্ম নিয়ন্ত্রণে অনীহা :**
সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের ফলে আমাদের দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণকে ধর্মদ্রোহী কাজ বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫ অনুসারে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার ৬২.২%। জন্মনিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশে এখনো ততটা জনপ্রিয় নয়। এর ফলে আমাদের দেশে জন্মহার তেমন কমানো যাচ্ছে না।

১৪. **চিত্তবিনোদনের অভাব :**
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগণের চিত্তবিনোদনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নেই। স্ত্রী-সঙ্গ লাভই তাদের চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায়। ফলে গ্রামাঞ্চলে জন্মহার বেশি।

## Student Work — মানব সম্পদ

কোন দেশের শ্রমশক্তিকে সে দেশের মানব সম্পদ বলে। প্রকৃতি ও মানুষ যে কোন দেশের জাতীয় উৎপাদনের দুটি মৌলিক উপাদান। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ মানব শক্তির পর্যাপ্ত যোগান একান্ত অপরিহার্য। এই কারণে কোন দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ ও শ্রমশক্তিকে মানব সম্পদ বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্তুগত সম্পদ ও মানব সম্পদ - এ দুই-ই একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানব সম্পদ উন্নয়ন বলে। দক্ষ মানব সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান। কারণ জনসাধারণের কর্মনৈপুণ্য ও তাদের ধ্যান-ধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উল্লেখ্য যে, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগকে মানব মূলধন (Human Capital) বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত মূলধন ও মানব মূলধন উভয়ই সমভাবে প্রয়োজন।



Scanned by CamScanner

**মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :**

দক্ষ মানব সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ মূলক কর্মক্রম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রভৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত এ সমস্ত খাতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

১. **শিক্ষা :**

শিক্ষা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নেরও মুখ্য উপকরণ। সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে একদিকে প্রাথামিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে, অন্যদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বই-পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৩৭টি সরকারি ও ৮৩টি বেসরকারি এবং ২টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বি আই টি) গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়া দেশের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পলিটেনিক এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ডাবল শিফ্‌ট চালু করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ৩৪৩৭০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা মোট বাজেটের ১১.৬%।

২. **নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ :**

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৯৯৪ সালে থেকে মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৯.৩৬ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ২০১২ সাল থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজ জাতীয়করণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৩. **প্রশিক্ষণ :**

সরকারি চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলকে বিশেষায়িত করার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। দেশের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)। এখানে বি সি এস পরীক্ষায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা থেকে সচিব পর্যন্ত সবার জন্য রয়েছে মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বি এম এ) এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ। পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে সারদা পুলিশ একাডেমি এবং পুলিশ স্টাফ কলেজ। একই ভাবে প্রকৌশলীদের জন্য রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ। এমনিভাবে দেশের প্রতিটি পেশার জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন কারিগরি ও অ-কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

৪. **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :**

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। গত এক দশকে দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন ও মৃত্যুহার হ্রাস ও গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৯৭০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেটে ১২৬৯৫ কোটি টাকা স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৫. **নারী ও শিশু উন্নয়ন :**

নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারার সঙ্গে নারীকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অক্টোবর/২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৩ মেয়াদে ১৮৮১.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে 'তথ্য আপা' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১২০২.২৯ লক্ষ্য টাকা।

শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এবং শিশু, পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের কোন বিকল্প নেই। তাই শিশু-কিশোর কল্যাণ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যেসব প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তার মধ্যে রয়েছে শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা, সিসিমপুর আউটরিচ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মনিটরিং চাইল্ড রাইটস ইত্যাদি প্রকল্প।



Scanned by CamScanner

**৬. যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন :**

যুব সমাজ দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শ্রমশক্তি। যুবসমাজের সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বেকার যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ ও যুব অনুদানের মাধ্যমে দেশের মানবসম্পদ পরিণত করার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যুব কর্মসূচিকে দেশের সকল উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারেও কাজ করছে। দেশের ৬৪ টি জেলায় যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সহ কম্পিউটারে বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ও ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ক্লাবভিত্তিক যুব কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ ও জোরদার করার উদ্দেশে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে।

**৭. সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :**

দেশের ভূমিহীন, দুস্থ, ভবঘুরে, এতিম, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন নিয়মিত কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত

ক) সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম

খ) পল্লীমাতৃ কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও

গ) শহর সেবা কার্যক্রম কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা যায়।

**৮. সাংস্কৃতিক উন্নয়ন :**

একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা ও জাতীয় চরিত্র সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতির ব্যাপক বিস্তার লাভ ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও সমঝোতার লক্ষ্যে এ যাবৎ ৪০টির ও অধিক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি, সম্পাদিত হয়েছে। দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অবকাঠামো জোরদার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় চিত্রকলা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সোনারগাঁয়ে শিল্পগ্রাম উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। পর্যটন নগরী কক্সবাজারে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এছাড়া রাজশাহীতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। রাজশাহীতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ও মৌলভীবাজারে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী এবং কুষ্টিয়ায় লালন একাডেমী ইত্যাদির অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে।

## Student Work বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধাণের উপায়

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হলে জনাধিক্যজনিত সমস্যা দূর করতে হবে। নিম্নোক্ত উপায়ে বাংলাদেশে জনসংখ্যাজনিত সমস্যা দূর করা যেতে পারে :

**১. পরিবার পরিকল্পনা :**

পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নবজন্মের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করা যায়। সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা প্রায় সব দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য গ্রাম্য জনগণের একাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথাকে এখনও মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারছেনা। বাংলাদেশে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার মাত্র ৬২.২%।

**২. শিক্ষার প্রসার :**

শিক্ষার প্রসার জনসংখ্যা রোধে সহায়তা করে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সাধারণত বেশি বয়সে বিয়ে করে। তদুপরি, শিক্ষিত লোকেরা উন্নত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে বলে অধিক সন্তানে আগ্রহী হয় না। তাছাড়া, দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনগণকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা যাবে এবং তাতে জনসংখ্যা সমস্যা হ্রাস পাবে।

**৩. আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ :**

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা রোধ করতে হলে আইনের সাহায্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করতে হবে। বাংলাদেশে এ ব্যাপারে আইন থাকলেও তার যথাযথ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। সুতরাং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত বর্তমান আইন সংস্কার করে এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বে মেয়েদের বিবাহও পুরুষের বহুবিবাহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তা কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার।



Scanned by CamScanner

৪. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :**
দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যায়। উন্নতমানের রাসায়নিক সার প্রয়োগ যন্ত্রের সাহায্যে চাষ, সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি দ্বারা আমাদের কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এছাড়া শিল্প ও সেবা খাত উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের মাথাপিছু জি ডি পি বর্তমানের ১৩১৬ মার্কিন ডলার থেকে কয়েকগুণ বাড়ানো দরকার।

৫. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :**
কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বাংলাদেশের জনগণ দরিদ্র। দরিদ্র দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। ডি. ক্যাস্টো তাঁর বিখ্যাত 'Geography of hunger' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অধিক। অতএব জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের জনগণের বাস ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য কৃষি খাতে কর্মসংস্থান কমিয়ে শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. **জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন :**
জনাধিক্য জনিত সমস্যা দূর করতে হলে জাতীয় আয়ের বণ্টন ব্যবস্থা সুষম করা দরকার। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের জাতীয় আয় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়লে জনসংখ্যা সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে। দেশের কৃষক, মজুর তথা সকল শ্রেণীর দরিদ্র জনসাধারণ যাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো সহজে লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৭. **জনসংখ্যার পুনর্গঠন :**
বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৩৫ জন (অ.স. ২০১৫)। কিন্তু এ হার সর্বত্র সমান নয়। কোথাও অত্যাধিক আবার কোথাও কম। এ জন্য ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার কিছুটা মোকাবেলা করা যায়। দেশের যেসব এলাকায় লোকবসতি কম সে সব এলাকায় লোকবসতির ব্যবস্থা করে সেখানে উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

৮. **মহিলাদের কর্মসংস্থান :**
আমাদের দেশের মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১.৬২ কোটি মহিলা। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে মহিলাদের জন্য ঘরের বাইরে কাজের সংস্থান করতে পারলে আমাদের দেশে জন্মহার হ্রাস পাবে। তাছাড়া, কর্মজীবী মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি বলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়াও সম্ভব হবে না।

৯. **অভিবাসন :**
বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অভিবাসনের (Migration) বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এখনও পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির অভাব রয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ঐসব দেশে লোক পাঠানোর কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

১০. **নারীর ক্ষমতায়ন :**
বাংলাদেশের নারী সমাজের সিংহভাগ ঘরের বাইরে গিয়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে না। ফলে তারা পরিবারের জন্য আয় উপার্জনে অক্ষম। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাদের মর্যাদা কম। ফলে অনেক সময় তাদের মতের বিরুদ্ধে ও তাদের উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং দেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে হলে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

## বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পদ না দায়

জনসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের জনগণের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাছাড়া জনশক্তির পরিমাণ ও গঠন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে। দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। কারণ সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির অভাব ঘটে।

পক্ষান্তরে দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তাতে মাথাপিছু জমি ও মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। আবার বয়স অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টনের উপরেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। দেশের জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে জনসংখ্যার মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বেশি হলে কর্মক্ষম জনশক্তি হ্রাস পায় বলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এছাড়া জনগণের কর্মকুশলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের আগ্রহ প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। পক্ষান্তরে জনগণের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও নেতিবাচক জীবনবোধ প্রভৃতি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।



Scanned by CamScanner

সুতরাং কোন দেশে জনসংখ্যা সমস্যা আছে কিনা অর্থাৎ জনসংখ্যা সে দেশের সম্পদ কি দায় তা বুঝতে হলে সে দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ, জন্ম ও মৃত্যুহার, জনগণের মানসিক গঠন, জনসংখ্যার বণ্টন প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। নিম্নে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হলো :

০১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫ অনুসারে বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৭৯ লাখ এবং বর্তমান তা বার্ষিক ১.৩৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার আধিক্য দেশে তীব্র খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। বর্তমানে আমাদের কে প্রতি বছর বিদেশ থেকে গড়পড়তায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। খাদ্যশস্য আমদানি করতে না হলে ঐ টাকায় যন্ত্রপাতি আমদানি করা যেত এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতো। সুতরাং আমাদের বিরাট জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

০২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন অপরিহার্য। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে আয় সৃষ্টি হচ্ছে তা আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভরণপোষনের জন্য ব্যয়িত হওয়ার ফলে দেশে মূলধনের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এতে অর্থনৈতিক উন্নয় ব্যাহত হচ্ছে।

০৩. বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৩৫ জন লোক বাস করে। শিল্পোন্নত দেশে জনঘনত্ব বেশি থাকলেও ক্ষতি নেই। কারন তারা তা পোষন করতে পারে। কিন্তু কৃষি প্রধান বাংলাদেশে এরূপ অধিক জনঘনত্বের ফলে কৃষিক্ষেত্রে ছদ্মবেশী বেকারত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

০৪. বাংলাদেশে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের জনগন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। জনসংখ্যা যতই হ্রাস পাবে, ততই অধিক পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল ভোগ করা যাবে।

০৫. উন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কার্যকর চাহিদা (effictive dimant) বৃদ্ধি পায়। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের মূল সমস্যা হল যোগান বৃদ্ধির সমস্যা, কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধি নয়। সুতরাং আমাদের দেশের বর্ধিত জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করা দূরে থাকুক বরং তা উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

০৬. আমাদে জনসংখ্যার গঠন ও উন্নয়ন ও উন্নয়নের অনুকূল নয়। আমাদের দেশে কর্মক্ষম বয়সের মধ্যে শতকরা মাত্র ৪৯ জন লোক আছে। অর্থাৎ আমাদের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ কর্মক্ষম নয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় স্বরূপ।

০৭. দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় আমাদের দেশে শিল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে।

০৮. দেশের জনগণের মানসিক গঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে এখনও পর্যন্ত তত সহায়ক নয়। যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে আমাদের দেশের মানুষ নানারূপ প্রতিকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে। ফলে আজও তারা দারিদ্র, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখনও গুটিকয়েক শিক্ষিত ও বিত্তশালী লোকের দায়িত্ব ও স্বার্থরূপে পরিগণিত হচ্ছে। দেশের আপামর অশিক্ষিত জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতাও নেই। আগ্রহও নেই।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বিপুল জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে দেশের অগ্রযাত্রাকে বিঘ্নিত করছে। ফলে বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা আমাদের জন্য সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## Student Work

### উপজাতীয় সংস্কৃতি

বাংলাদেশে অনেক উপজাতি রয়েছে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিও আছে। উপজাতি ভেদে, এমনকি স্থানভেদে একই উপজাতির বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাদের সংস্কৃতির পার্থক্য দেখা যায়। তবে কিছু কিছু বিষয় সকল উপজাতির মধ্যেই প্রায় অভিন্ন। যেমন উপজাতিরা সাধারণভাবে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করে। আবার কিছু কিছু বিষয় কেবল একেকটি উপজাতির নিজস্ব ব্যাপার। যেমন বসন্তে মনিপুরী, সাঁওতাল এবং ওরাওঁ উপজাতি আবির উৎসব পালন করে, ফাল্গুন মাস থেকে সাঁওতাল বর্ষ গণনা শুরু হয়, ওঁরাও যুবক-যুবতীরা অগ্নিখেলার মধ্যে দিয়ে বছরের প্রথম রাতটি উদ্‌যাপন করে। এসব উৎসবের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে ঢোল, মাদল, করতাল ও বাঁশি।



Scanned by CamScanner

চাকমা ও তঞ্চংগাদের মধ্যে পালাগান বিশেষ জনপ্রিয় সঙ্গীত। মণিপুরী ও গারোদের মধ্যে ঋতুভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান সবচেয়ে বেশি। দোল পূর্ণিমার মধ্যরাত থেকে মাসাবধি মণিপুরী যুবক-যুবতীরা মুক্তমাঠে নৃত্য করে। ধান কাটার সময়ও কর্মরত যুবক-যুবতীরা পরস্পর গান ও ছড়া কাটার মাধ্যমে আনন্দমুখর হয়ে উঠে। মালপাহাড়ি যুবক-যুবতীরাও মাতাল হয়ে রাতভর নাচগান করে। সাঁওতালরা শস্য তোলার উৎসব 'সাহারাই' ৩-৪ দিন ধরে সাড়ম্বরে পালন করে। এ উৎসবে সাঁতাল যুবক-যুবতীরাও মনিপুরীদের ন্যায় নাচগান করে। এতে বাদ্যযন্ত্র থাকে মাদল, মৃদঙ্গ ও বাঁশি। মণিপুরী ও সাঁওতালদের ন্যায় গারো যুবক-যুবতীরা 'ওয়াংগালা' অনুষ্ঠানে সম্মিলিত নাচগান করে। শস্য বপন ও আহরণের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গোটা উপজাতিটি এ সময় আনন্দে মেতে ওঠে। গভীর রাতে গারো যুবক-যুবতীরা মদ্যপাত্র হাতে নিয়ে নৃত্য করে। এ নৃত্যে মহিষের শিংয়ের শিঙ্গা উচ্চস্বরে বাজে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা ও নৃত্য ও উদ্দাম হয়। যুবক-যুবতীরা নৃত্যের তালে তালে স্ব-স্ব প্রিয়জনের মুখে বারংবার মদ ঢেলে দেয়। গারোদের এ ওয়াংগালা অনুষ্ঠানে যে তাণ্ডব নৃত্য করা হয় তার লক্ষ্য অশরীরী অপশক্তিকে ভয় দেখিয়ে বশ করা। তারা ভোগ দিয়েও অপশক্তিকে বশ করার চেষ্টা করে। মগরা গান বাজনা, নৃত্য ও মদ্যপানে মত্ত হয়ে মগি (মঘি) সালের প্রথম তিন দিন অতিবাহিত করে।

**ধর্মীয় বিশ্বাস ও ট্যাবু :**

গারোদের সাংসারেক এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় উপজাতির বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য কোন উপজাতির সুনির্দিষ্ট কোন ধর্ম নেই। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সংস্কার, বিশ্বাস ও প্রথাই তাদের ধর্ম। গারোদের সাংসারেক ধর্ম ও এখন বিলুপ্ত প্রায়। তাদের অধিকাংশই এখন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। তবে সাংসারেক ধর্মের পর্ব-পার্বণও তারা কিছু পালন করে। সাঁওতালরা অধিকাংশই খ্রিষ্টান, কিন্তু তারা স্ব-স্ব প্রচলিত প্রথা মেনে চলে। ওঁরাও, মণিপুরী এবং বৌদ্ধ উপজাতিগুলির মধ্যে অমাবস্যা-পূর্ণিমা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ণিমায় তারা বহুবিধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে।

**সৃষ্টি তত্ত্ব :**

গারোদের মতে, নান্তনপান্ত নামক এক রমণী সাগরতলা থেকে কচ্ছপের আনা এক মুঠো মাটি দিয়ে ভূমি তৈরি করে এবং সূর্যদেবের সাহায্যে শুকিয়ে তা বাসোপযোগী করে। মণিপুরী পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে পরম গুরু শিদারা ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির পরিকল্পনায় প্রথমে ৯ + ৭ জন দেব-দেবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবী তখন জলমগ্ন। দেবতারা স্বর্গ থেকে মাটি নিক্ষেপ করতে থাকেন, আর দেবীরা চক্রাকারে নৃত্য করে নিক্ষিপ্ত মাটি সমান করে ভূতল সৃষ্টি করেন। খাসিয়াদের বিশ্বাস থু-ব্লোউ প্রথমে পৃথিবী, তারপর একজোড়া নর-নারী সৃষ্টি করেন। এভাবেই মানব জীবনের উদ্ভব ঘটে।

**কৃষি কাজ :**

কোন কোন উপজাতি ভূমিকে মা মনে করে, তাই শস্য বপনের সময় তারা ভূ-মাতার পূজা করে। সাঁওতাল শস্যক্ষেত্রকে আভূমি প্রণাম করে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, ভূ-মাতার ঋতুস্নান হয় বলেই শস্য উৎপাদিত হয়। এ জন্য তারা ভূ-মাতার ঋতুকালে বিভিন্ন পর্ব পালন করে। কোন কোন উপজাতি ভূমিকে গর্ভবতী নারীর মত সাধ খাওয়ায়। ওঁরাও এবং সাঁওতালরা ফোঁটা দেয়। গারো ও মনিপুরীদের মত সাঁওতাল এবং আরও কিছু উপজাতীয় নারী-পুরুষ একসঙ্গে মাঠে কাজ করে। জঙ্গল সাফ ও চাষের কাজ করে পুরুষরা, আর উৎপাদনের প্রতীক মেয়েরা করে বপন-রোপনের কাজ। শস্য বপন ও কর্তনের সময় প্রায় সব উপজাতিই স্বর্গীয় পদ্ধতিতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান পালন করে। যুবক-যুবতীরা পরস্পর গান ও ছড়া কাটার মাধ্যমে মাঠ থেকে পাকা ফসল ঘরে তোলে।

**বিবাহ :**

বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপজাতিতে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে। তেমনি রয়েছে বৈসাদৃশ্যও। পূর্বরাগ উপজাতীয় বিবাহের মূল সূত্র, তবে তা অবশ্যই প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হতে হবে। সাঁওতালদের মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। বরপক্ষ কনে পক্ষকে পণ দেয়। পাত্রীদেখা, পানচিনি, গায়ে হলুদ ইত্যাদি তাদের প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠান। বিবাহের দিন উভয়পক্ষের মেয়েরা বিয়ের গীত গায়। ওঁরাও ও মণিপুরীরা বর্ণাঢ্য বিবাহ মন্ডপ তৈরি করে। সাঁওতাল এতে মঙ্গল খাট বসায়। মণ্ডপে বর-কনে পরস্পরের কপালে সিঁদুর দেয় এবং উভয় পক্ষের মেয়েরা তখন উলুধ্বনি দেয়।

মগ যুবক-যুবতীরা নববর্ষ পালন উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ পায় এবং তখন তারা অভিভাবকদের অনুমোদন সাপেক্ষে জীবনসঙ্গী বেছে নেয়। গারো, খাসিয়া, টিপরা ও মগ মেয়েরা বাজারে কেনা-বেচা করতে যায়। এ সুযোগে যুবক-যুবতীদের মধ্যে মনের মিল হয় এবং পরে অভিভাবকদের অনুমোদন ক্রমে তাদের বিয়ে হয়। গারো ও মনিপুরীদের মতো সাঁওতাল এবং আরও কিছু উপজাতীয় যুবক-যুবতী একসঙ্গে মাঠে কাজ করার সময় জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়।

কতিপয় উপজাতিতে তালাক বৈধ হলেও তা বিরল। সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের মধ্যে তালাক সিদ্ধ, তবে অকারণে তালাক ঘৃণ্য। ওঁরাও, খাসিয়া, চাকমা ও মগদের মধ্যে তালাক বিধিসম্মত হলেও তা কদাচিৎ হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর-কনে উভয়ের এবং গোত্রপতিদের সম্মতিতে তালাক হয়। খাসিয়াদের মধ্যে স্ত্রীর কারণেই তালাক হয়, আর স্বামীর কারণে যদি তালাক হয় তাহলে তাকে বেত ও জুতা মারা হয় এবং মুখে চুনকালি মাখিয়ে ও মাথা কামিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। সন্তান সম্ভবার তালাক নিষিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পর বিধবা বিবাহ সিদ্ধ।



Scanned by CamScanner

**পোশাক-পরিচ্ছদ :**

ওঁরাওসহ আরও অনেক উপজাতির সাধারণ পোশাক ধুতি-শাড়ি। নিম্ন স্তরের গারোরা আজও নেংটি পরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বর্তমানেও কোন কোন উপজাতির কাটিবসন বৃক্ষপত্র। সাঁওতালি পোশাকের নাম পাঁচি, পাঁচ তাত ও মথা, চাকমাদের প্রধান পরিধেয় লুঙ্গি, গামছা তাদের একটি চিরচরিত পোশাক। মেয়েদের পোশাক কখন্ড লাল-কালো কাপড়, চাকমা ভাষায় যাকে বলা হয় পিন্ধন। আর গায়ে পরা হয় ব্লাউজের মতো সিলুম। মগরা বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত থামি এবং ফুলহাতা ব্লাউজ পরে।

**সাজসজ্জা :**

উপজাতীয়দের অলঙ্কারে বৈচিত্র্য কম। উত্তর বঙ্গীয় উপজাতীয়দের গহনাপত্র প্রায় একই রকম । সাওতাল ও ওঁরাওরা হাত, পা, নাক, কান ও গলায় গহনা পরে। ওঁরাওরা চুড়া করে চুল বাঁধে এবং টিকলি পরে। চাকমা মেয়েরা চুড়ি, খাড়ু, গলায় টাকার ছড়া এবং বড়ো ছিদ্র করে কানবালা পরে। গারো মেয়েরা খোপায় ফুল গোঁজে। মগ মেয়রা 'সানাকা' নামক এক প্রকার বনজ পাউডার মেখে মুখ উজ্জ্বল করে।

**খাদ্যপানীয় :**

উপজাতিরা তাদের টোটেম ছাড়া আর সবই খায়। বিড়াল গারোদের টোটেম, তাই তারা বিড়াল খায় না। মগ, চাকমা ও খাসিয়ারা গোমাংস এবং গারোরা গোদুগ্ধ খায় না, মগ ও চাকমা নর-নারী ধুমপানে অভ্যস্থ। টক ও পচা চিংড়ির প্রস্তুত খাদ্য তাদের প্রিয়। ওঁরাওরা ইঁদুর, বাইন মাছ, আলু, খেসারির ডাল ইত্যাদি খায়। ভাতপচানো মদ সব উপজাতিরই প্রিয় পানীয়।

**সামাজিক বিধিবিধান :**

মাতৃতান্ত্রিক উপজাতিত পুরুষ সম্পত্তির ওয়ারিশ নয়। ছেলেরা যেমন মাতৃগৃহে, তেমনি স্ত্রীগৃহেও অবহেলিত। মায়ের মৃত্যুর পর গারো কন্যাদের পিতার প্রতি কোন দায়িত্ব থাকেনা, কিন্তু খাসিয়াদের মধ্যে তা অবশ্য পালনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সাঁওতালরা গোত্র প্রধানকে বলে রাজা, আর খাসিয়ারা বলে মন্ত্রী। প্রায় সব উপজাতিতেই যৌন-ব্যভিচার দোষনীয়। প্রাকবিবাহ যৌন সম্পর্ক হলে সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিবাহ অবশ্য কর্তব্য। ওঁরাওরা নবজাতকেরা সুখে প্রথম দেয় ছাগী কিংবা মায়ের দুধ, অন্যরা দেয় মধু; আর প্রসূতিকে খেতে দেয় হলুদ পানি, প্রায় সব উপজাতিই অশরীরী অপশক্তি থেকে শিশু ও মাকে রক্ষার জন্য ঘরের চর্তুদিকে কাঁটার বেড়া দেয়; ওঝা-বৈদ্যরা ঘর বন্ধন করে এবং ঝাড়ফুঁক দেয়। শুকর, কুকুর মোরগ ইত্যাদি উপজাতীয়দের গৃহপালিত পশু। ওঁরাওরা গরুর খুব যত্ন নেয়।

**মৃতের সৎকার :**

পূর্বপুরুষের অসন্তুষ্ট আত্মা যাতে কোনরুপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সে জন্য মৃতের উদ্দেশ্যে উপজাতিরা পশু উৎসর্গ করে এবং কান্না করে। তারপর সাধ্যমতো উপঢৌকনসহ মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধকর্ম করে। প্রেত সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক সময় তারা মানুষও উৎসর্গ করত। উপজাতিভেদে এসব প্রক্রিয়া কিছুটা ভিন্নতর হলেও একটা মৌলিক ঐক্য রয়েছে। কুষ্টিয়ার আদিবাসীরা মৃতদেহকে অবিলম্বে কবরস্থ করে এবং শবযাত্রীরা নদীতে গোসল করে বাড়ি ফেরে। মগ ও চাকমারা শব দাহ করে। মণিপুরীরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে ঘরের বাইরে কলাপাতায় শুইয়ে হরিনাম কীর্তন করে। মৃত্যুর পর উত্তরমুখী করে শুইয়ে শব ধৌত করে এবং কীর্তন করতে করতে শ্মশানে নিয় যায়।

**বাসগৃহ :**

সব পাহাড়ি উপজাতিই মাচার উপর বাঁশ, বেত, কাঠ ও পাতা দিয়ে ঘর তৈরি করে। ঘরে ওঠার জন্য থাকে মই। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার যাতে উপরে উঠে আসতে না পারে সেজন্য রাতের বেলা মই সরিয়ে ফেলা হয়। মগরা বাড়ি করে সমতলে। ওঁরাওরা গোবর দিয়ে লেপেপুছে বাড়ি পরিস্কার রাখে। তাদের ঘরগুলি সাধারণত ঘড়ের ছাউনিযুক্ত মাটির ঘর, তবে শোলার বেড়ার ঘরও আছে। মাঠির দেয়ালে তারা লতাপাতার নকশা আঁকে। বাংলাদেশের এ উপজাতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহু দেশের লোকসংস্কৃতিতে লক্ষণীয়।

**প্রাচীন বাংলার রাঢ় জনপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** (৩৫তম বিসিএস)

রাঢ় প্রাচীন বাংলার একটি স্বতন্ত্র ভূ-রাজনৈতিক এলাকা তথা জনপদ। সম্ভবত বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি বড় অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জৈন ঘটনাপঞ্জি আচারঙ্গসূত্রে সর্বপ্রথম রাঢ়, রারহ, লাঢ় ও লার-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে মহাবীর ধর্ম প্রচারকালে বজ্জভূমি ও শুব্ভভূমির অন্তর্ভুক্ত পথহীন লাঢ় দেশ পরিভ্রমণ করেন। এ সময় জনপদটি ছিল 'দুর্গম ও নৈরাজ্যময়' এবং সেখানকার অধিবাসীরা মহাবীরের প্রতি রূঢ় আচরণ করে। দীপবংশ ও মহাবংশে এরূপ জনশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে যে, বিজয় শ্রীলংকা আবাদ করে সেখানে জনবসতি গড়ে তুলেছিলেন এবং এই বিজয় ছিলেন 'লাল'-এর অন্তর্গত সিংহপুরের অধিবাসী। এই 'লাল' রাঢ়ের সঙ্গে শনাক্তীকৃত। মথুরায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ আকারে সম্ভবত সর্বপ্রথম রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাতে 'রাঢ়' রাজ্যের অধিবাসী এক জৈন সন্ন্যাসীর অনুরোধে একটি জৈন মূর্তি নির্মানের উল্লেখ আছে।



Scanned by CamScanner

খাজুরাহোতে প্রাপ্ত শিলালিপির বিবরণে চন্দেলারাজের হাতে রাঢ়সহ বিভিন্ন রাজ্যের রাণীদের বন্দি হওয়ার ঘটনার উল্লেখ আছে। বল্লালসেন-এর নৈহাটী তাম্রশাসনে রাঢ়কে সেন রাজাদের পিতৃভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপিতে উল্লেখ আছে যে, রাঢ় ছিল একটি জলশূন্য শুষ্ক ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে এ বর্ণনার মিল রয়েছে। দিগ্বিজয়প্রকাশ-এর উল্লিখিত একটি জনশ্রুতিতে দামোদর নদের উত্তরে ও গৌড়ের দক্ষিণে রাঢ়ের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। তবকত-ই-নাসিরী-র বর্ণনায়ও গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ়ের অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় নয় ও দশ শতকের শিলালিপি ও সাহিত্যে রাঢ়ের দুটি বিভাগের উল্লেখ আছে, যথা দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ়। পশ্চিবঙ্গের আধুনিক হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন বৃহদাকার বসতি স্থানসমূহ বা অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য অংশ দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এর দক্ষিণ সীমা সম্ভবত রূপনারায়ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও পশ্চিম সীমা প্রসারিত ছিল দামোদর নদের অপর পারে অবস্থিত আরামবাগ মহকুমা পর্যন্ত।

## Student Work | সংক্ষিপ্ত

### দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান :

(৩৫তম বিসিএস)

প্রায় ষোল কোটি মানুষের এই দেশ বাংলাদেশ। দেশটির মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে এ দেশটির অবস্থান। পৃথিবীর মানচিত্রে উত্তর অক্ষাংশের ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ এবং পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ মধ্যবর্তী স্থানে বাংলাদেশ অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মিয়ানমার; পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কিমি। এর মধ্যে ভারত সংলগ্ন স্থল ও নৌ সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সঙ্গে রয়েছে ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। অন্যদিকে মোট জলসীমার পরিমাণ ৭১১ কিলোমিটার। সেই সাথে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দেশ হওয়ায় এ দেশের ভূখন্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশটির উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত দূরত্ব ৭৬৫ কি.মি.। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪৭৬ কি.মি.। আন্তর্জাতিক সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্রিনিচ মান সময় থেকে ৬ ঘন্টা এগিয়ে রয়েছে। কারণ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান পূর্বাঞ্চলীয় সময়াংশে।

### বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

(৩৫তম বিসিএস)

বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের উত্তরের সম্প্রসারিত বাহু। ভৌগলিকভাবে ৫° উত্তর থেকে ২২° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮০° পূর্ব থেকে ১০০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এ উপসাগরটির পশ্চিমে ভারত ও শ্রীলংকার পূর্ব উপকূল, উত্তরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীপ্রণালী সৃষ্ট বদ্বীপ এবং পূর্বে মিয়ানমার উপদ্বীপ থেকে আন্দামান-নিকোবর শৈলশিরা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমা শ্রীলংকার দক্ষিন থেকে সুমাত্রার উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ২২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। মালাক্কা চ্যানেল ও পারস্য উপসাগরের সাথে সংযোগ থাকায় বঙ্গোপসাগর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক রুট হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বলাই বাহুল্য। ইলমেনাইট, গ্রানাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এবং প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে এ উপসাগরে। আর পৃথিবীর প্রায় ৩০ শতাংশ জেলে বঙ্গোপসাগরে উপর নির্ভরশীল। হোয়াইট গোল্ড নামে পরিচিত সামুদ্রিক চিংড়ির মজুদ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত এ উপসাগরে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। যেমন- লইট্যা, লাক্কা, পোয়া, রূপবান, চান্দা, ছুরি, ফাইস্যা, ইলিশ, অয়েল সারডিন, টুনা প্রভৃতি। এর তলদেশে প্রচুর তেল মজুদ রয়েছে যা বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

### বাংলাদেশের বনজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

(৩৫তম বিসিএস)

যেসব ভূমিতে ছোট, মাঝারি বা বড় ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের বৃক্ষের সমাবেশ ঘটে তাকে বনভূমি বলে। আর বনভূমিতে উৎপাদিত বা প্রাপ্ত সম্পদকে বনজসম্পদ বলা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বনজসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পরিবেশ রক্ষার জন্য সে দেশের মোট আয়তনের ২৫% বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূপরিমাণ প্রায় ১১.০৪%। জলবায়ু, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এ দেশের বনভূমিকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা- ১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি, ২. ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন, ৩. স্রোতজ বনভূমি বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি।



Scanned by CamScanner

১. **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি :** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভাগের জেলাগুলোর পাহাড়ি এলাকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এ বনভূমি গড়ে উঠেছে। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১৪,১০২ বর্গ কিমি। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন এ অঞ্চলে বনভূমি গড়ে উঠেছে। চিরহরিৎ বৃক্ষের মধ্যে ময়না, তেলসুর, চাপালিস প্রভৃতি প্রধান। পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে গর্জন, গামারি, জারুল, সেগুন, কড়ই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এ বনাঞ্চলে নারিকেল, জলপাই, হরিনা প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মে।

২. **ক্রান্তীয় পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন :** বাংলাদেশের এ বনভূমি দু'টি অংশে বিভক্ত। যথা- (ক) মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি, (খ) বরেন্দ্র বনভূমি। এ দুটি অংশের মোট আয়তন ১,৩৩৮ বর্গ কি.মি. প্রায়। এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গজারি, শাল, কড়ই, হিজল, বহেরা প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে।

৩. **শ্রোতজ বনভূমি :** এর প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ সুন্দরবন। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এ বনাঞ্চল অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান গরান বৃক্ষের বনভূমি। এর আয়তন প্রায় ৬,৪৭৪ বর্গ কি.মি. প্রায়। এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গেওয়া, বাইন, কেওড়া, গড়ান, নোনাঝাউ, কাঁকড়া, ধুন্দল, হেতাল ইত্যাদি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বাংলাদেশের বনজসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে বনজসম্পদের অবদান ১.৭২%। এ খাতে বর্তমানে প্রবৃদ্ধির হার ৫.১০%। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা ২ ভাগ এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে। দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাষ্ঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সার্বিক বন উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০ বছরব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) বন মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত এবং সেই লক্ষ্যে কিছু কাজও হয়েছে।

## তিস্তার পানি সংকটের পরিবেশগত প্রভাব :

(৩৫তম বিসিএস)

বাংলাদেশের ৮০% এলাকাই নদী প্লাবন ভূমি। নদীবাহিত পলিমাটির স্তরায়নের মাধ্যমেই কোটি কোটি বছর ধরে বাংলাদেশ নামক ভূখন্ড তথা বঙ্গীয় বদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যে তিস্তা অন্যতম। তিস্তা নদীর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩১৫ কি.মি., তার মধ্যে ১১৫ কি.মি. বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে প্রবাহিত।

**তিস্তা পানি সংকটের পরিবেশগত প্রভাব :** ১৯৭৭ সালে ভারত কর্তৃক নির্মিত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির গজলডোবা ব্যারেজ ছাড়াও তিস্তা নদী এবং এর অন্যান্য শাখা নদীর উপর পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য জলবিদ্যুত প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত তিস্তার স্বাভাবিক প্রবাহকে বিঘ্নিত করছে। ঐতিহাসিকভাবে শুষ্ক মৌসুম অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে তিস্তার প্রবাহ থাকে ৫,৮৮৫ কিউসেক। সেখানে ২০১৫ সালের ১১ মার্চ পানি প্রবাহ ছিল মাত্র ৩৫০ কিউসেক, যা ছিল এ যাবৎকালের সর্বনিম্ন প্রবাহ।

এদিকে, তিস্তা চুক্তি না হওয়ার কারণে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পানি প্রবাহ কমে আসায় প্রতিবছর কৃষি কাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীর উজান ও ভাটিতে জেগে উঠেছে ধূ-ধূ বালুচর। দেশের সর্ববৃহৎ সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ চরম পানি সংকটে পড়ায় ব্যাহত হয় সেচ কাজ। পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উজান থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহারের কারণেই এমনটা হচ্ছে। এর ফলে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে বাংলাদেশের কৃষকরা। বর্তমানে উত্তরের মানুষের বেদনার নাম তিস্তা সেচ প্রকল্প। ছয় জেলার সাড়ে ৪ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে শুরু হয়েছিল এ প্রকল্পের যাত্রা। কিন্তু পানির অভাবে পূরণ হয়নি এই স্বপ্ন। পানিশূন্যতায় ৫৩০ কিলোমিটার সেচ খাল এখন অনেকটাই অকার্যকর। ১৯৯০ সালে এর নির্মাণ শেষ হলেও ১৯৯৮ সাল থেকে এর সুবিধা পায় কৃষক। শুরুতে ব্যারেজের আওতায় সেচ সুবিধার লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ১১ হাজার হেক্টর জমি। কিন্তু অভিন্ন নদী সত্ত্বেও ভারত একতরফা তিস্তার পানি প্রত্যাহার করায় ব্যারেজের সেচ সুবিধা কমিয়ে ৬০ হাজার হেক্টর করা হয়। তবে প্রতিবেশি দেশটির একচেটিয়া পানি প্রত্যাহারে গত কয়েক বছর ধরে পূরণ হচ্ছে না সেই লক্ষ্যমাত্রাও। অন্যদিকে পানি সংকটের ফলে নদীর নাব্যতা ও জীববৈচিত্র্য যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি বালুচর ও অনুর্বর জমির পরিমাণ বাড়তে থাকায় পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছে।

## বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় :

(৩৫তম বিসিএস)

বাংলাদেশী হিসেবে আমরা পরিবেশ বিপর্যয়ের সাথে ভালোই পরিচিত রয়েছে। এখানে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, নদী ভাঙন ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ঘটে, তেমনি মানুষ কর্তৃক পরিবেশ বিপর্যয় যেমন- নদী দূষণ, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, বণ্যপ্রাণী নিধন প্রভৃতি ঘটনাও কোনো অংশে কম নয়। বলাই বাহুল্য পরিবেশ বিপর্যয় আমাদের বাসভূমিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ঠেকানো সম্ভব না হলেও মানবসৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়কে ঠেকানো যায়। কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ও নাগরিকদের পরিবেশ সচেতনতা কম থাকায় পরিবেশ দূষণের ঘটনা এখন চরম পর্যায়ে পৌছেছে।



Scanned by CamScanner

বাংলাদেশ আয়তনে একটি ছোট দেশ হলেও জনসংখ্যা রয়েছে এখানে মাত্রাতিরিক্ত। এই জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়েরও অন্যতম একটি কারণ। নদী-খাল-বিল ভরাট, পাহাড়-টিলা কর্তন, বন ও বণ্যপ্রাণী নিধন, নদী দূষণ, বায়ু দূষণ এখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্যা। এছাড়াও পরিবেশবান্ধব নীতির অভাব, আইনের অপপ্রয়োগ প্রভৃতি বাংলাদেশের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। অথচ মানবজাতির সঠিকভাবে বসবাসের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য হলেও মানবসৃষ্ট নেতিবাচক কর্মকান্ডের জন্য পরিবেশ হয়ে পড়েছে ভারসাম্যহীন। এই অবস্থায় পরিবেশ বিরূপ আচরণ করে, জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য হুমকি সৃষ্টি করে, অনেক প্রাকৃতিক সমস্যা সৃষ্টির ফলে মানবজাতির বসবাস দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। মানবসমাজের জন্য বসবাসের অনুপযোগী ও ক্ষতিকর পরিবেশের এই অবস্থাই হলো পরিবেশের বিপর্যয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য দরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হ্রাস, রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ও পানি দূষণ বন্ধ করা, বনজ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, পরিকল্পিতভাবে নগরায়ন ও শিল্পকারখানা স্থাপন, পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, নদী থেকে অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ, নদী ভরাট বন্ধ, নদীর স্বাভাবিক গতিপথ সচল রাখা, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

## বাংলাদেশের নদী দূষণের প্রধান কারণ :

(৩৫তম বিসিএস)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। এ দেশে ছোট বড় প্রায় ৭০০ এর অধিক নদী ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর অধিকাংশই কালের বিবর্তনে ও মানবজাতির কার্মকান্ডে হারিয়ে গেছে কিংবা মৃত হয়ে গেছে। নদীর স্বাভাবিক স্রোত বা প্রবাহ বন্ধ হয়ে এবং পানি হ্রাস পেয়ে ভূ-দস্যুদের দ্বারা দখল হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে যে নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ রয়েছে সেগুলোও বিভিন্নভাবে দূষণের স্বীকার হয়ে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। নদীর তীরে কলকারখানা স্থাপন ও শহরের ময়লা আবর্জনার দ্বারা নদীর পানি দূষিত হয়ে এক ধরণের বিপর্যয় তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকার চারদিকের ৬টি নদী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী, এছাড়াও বিভাগীয় শহরগুলোর প্রধান নদীগুলো ভয়াবহ দূষণের শিকার।

**নদী দূষণের প্রধান কারণ :** নদী দূষনের জন্য যেসব কারণ প্রধান হিসেবে চিহ্নিত তা নিচে দেয়া হলো-

১. **শিল্পবর্জ্য :** নদী দূষণের প্রধান কারণ হলো নদীর পানিতে শিল্পবর্জ্যের দ্রবণ। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার শিল্প কারখানা। শুধু ঢাকার নদীগুলোর তীরেই গড়ে উঠেছে ১০ হাজারের অধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। এসব কারখানা থেকে প্রতিদিন নদীর পানিতে মিশছে ৬০ হাজার ঘন মিটারের বেশি বিষাক্ত বর্জ্য। নদী দূষণের ৬০ শতাংশই হচ্ছে এই শিল্পবর্জ্য থেকে। আর বাকি ৪০ শতাংশ হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল বা আবাসিক বর্জ্য থেকে।

২. **মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য :** শুধু ঢাকা নগরীতে প্রতিদিন ৩ হাজার ২০০ মেট্রিক টন উৎপাদিত গলিত বর্জ্য বুড়িগঙ্গা, বালু, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা নদীতে মিশছে। ফলে এসব নদীর পানির গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে। পানিতে যেখানে প্রতি লিটারে ৮ মিলিগ্রাম অক্সিজেন থাকার কথা রয়েছে সেখানে এসব নদীর পানিতে গড়ে প্রতি লিটারে ১০২ মিলিগ্রাম অক্সিজেন পাওয়া যায়। শীত ও শুষ্ক মৌসুমে নদীর কোনো কোনো অংশের পানিতে অক্সিজেন থাকে না বললেই চলে। অথচ প্রতি লিটারে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৫ মিলিগ্রামের নিচে হলে সেই পানি দূষিত হতে থাকে। ২ মিলিগ্রামের নিচে এলেই মাছসহ জলজ প্রাণী মারা যায়। সে বিবেচনায় ঢাকার সব নদীর পানিই এখন দূষিত।

৩. **অপরিকল্পিত নৌযান চলাচল :** অপরিকল্পিতভাবে নদীতে নৌযান চলাচলের কারণে নদীর পানি দূষিত হয়। এসব নৌযানে ব্যবহৃত জ্বালানি পরিবেশ দূষণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এছাড়া অতিরিক্ত নৌযান চলাচলে নদীর স্বাভাবিক বৈচিত্র্য নষ্ট হয়। তাই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর জ্বালানিচালিত নৌযান নদী দূষণের অন্যতম কারণ।

৪. **পরিবেশ সচেতনতার অভাব :** নদী দূষণের অন্যতম বড় কারণ হলো পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতার অভাব। নৌযানে চলাচলের সময় বিভিন্ন প্লাস্টিক ব্যাগ ও পলিথিন আমরা কোনো কিছু না ভেবেই নদীর পানিতে ফেলে দেই। অথচ এই প্লাস্টিক ও পলিথিন পানিতে ও মাটিতে মিশে যায় না, পঁচে না, গলেও না, ফলে নদীর প্রবাহ ব্যাহত হয়। বুড়িগঙ্গার নদীতলে কয়েক স্তরের পথিথিন ও প্লাস্টিকের স্তূপ পাওয়া যায়। এছাড়া মানব বর্জ্য নদীর পানি দূষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

৫. **নদী ভরাট ও দখল :** নদী ভরাট ও দখল, অবৈধভাবে বালু উত্তোলন নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে নষ্ট করে দিয়ে ও নদীকে সংকুচিত করার মাধ্যমে নদীর অস্তিত্বের উপর আঘাত হানে। নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে এমন অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

৬. **নদী রক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অভাব :** দেশের নদ-নদীগুলো বাংলাদেশের প্রাণ। মায়াজালের মত ছড়িয়ে থাকা এসব নদী রক্ষায় এখন পর্যন্ত সুস্পস্ট কোনো আইন না থাকায় এবং যা আছে তাও সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ না হওয়ায় নদীগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন উপায়ে নদীগুলো দূষণের স্বীকার হওয়ায় নদীর নাব্যতা হ্রাস ও লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নদী দস্যুদের মাধ্যমে নদীগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় নদী রক্ষা আইন ২০১৩ প্রণয়ন হলেও বাস্তবায়নে এখনো ধীরগতি লক্ষণীয়। তাই নদী দূষণ ও দখল রোধে প্রয়োজন আইনের বাস্তবায়ন ও জরিমানার বিধান রাখা।

এভাবে নানা উপায়ে দেশের নদীগুলো দূষণের শিকার হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে নদীগুলোকে স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে ও দূষণমুক্ত করতে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।



Scanned by CamScanner

## বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র : (৩৫তম বিসিএস)

লোহা ও চাকা আবিস্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার সূচনা ও জয়যাত্রা হলেও উন্নত সভ্যতার ছাপ পাওয়া যায়। ঐ যুগের মানুষের জীবনযাত্রা ও শহর ব্যবস্থাপনার নমুনা দেখে। মজবুত ও পরিকল্পিত ঘরবাড়ি, শহরের উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা মনব সভ্যতার ইতিহাসের অংশ হয়ে রয়েছে। আধুনিক যুগ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র অনেকটাই উল্টো। বিশেষ করে শহরের সিটি কর্পোরেশনগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এতই দুর্বল যে অল্প বৃষ্টির পানিতেই রাস্তাঘাট তলিয়ে যায়। পয়ঃনিষ্কাষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের খাল ও নালা নেই। উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে শহরের নোংরা আবর্জনা ও বর্জ্যগুলো নদীতে পড়ে পানির মারাত্মক দূষণ ঘটাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাব, দক্ষ ও পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব ও পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশের অনেক শহরেই বসবাসের যোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি চিত্র নিচে দেয়া হলো-

**বর্জ্যের ধরন :** যে কোনো নগর বা শহরে দুধরনের বর্জ্য দেখা যায়। একটি হলো শিল্প কারখানার বর্জ্য এবং অন্যটি আবাসিক বর্জ্য। দূষণের দিক থেকে উভয় প্রকার বর্জ্য সমানভাবে দায়ী। নদী দূষণের জন্য শিল্পকারখানার বর্জ্য বেশি দায়ী। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল বর্জ্য, মেডিকেল বর্জ্য, ট্যানারি বর্জ্য, টেক্সটাইল বর্জ্য, ই-বর্জ্য ইত্যাদি। আবাসিক বর্জ্যের মধ্যে খাবার উচ্ছিষ্ট বর্জ্য, মানব বর্জ্য, প্লাষ্টিক ও পলিথিন জাতীয় বর্জ্য, ফলমূল, মানুষের ব্যবহারকৃত পচনশীল ও অপচনশীল বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী। এর মধ্যে কতক রয়েছে শক্ত বর্জ্য এবং কতক রয়েছে তরল বর্জ্য।

**বর্জ্য উৎপাদন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র :** শুধু ঢাকা শহরের বর্জ্য উৎপাদন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকেই আমরা সারা দেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুমান করতে পারি। ঢাকায় প্রতিদিন ৪ হাজার টনের বেশি বর্জ্য উৎপাদন হয়। এর মধ্য থেকে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ২.৫ হাজার টন বর্জ্য অপসারণ করে। এই তথ্যটি দুই সিটি কর্পোরেশনের সূত্র থেকে প্রাপ্ত। যদিও অন্যান্য বেসরকারি সূত্র মতে তা ১.৫-২ হাজার টনের মত হবে। বর্জ্য অপসারণ করে আমিনবাজার ও মাতুয়াইল দুই ল্যান্ডফিলে রাখা হয়। এছাড়া ২০ শতাংশ বর্জ্য-আবর্জনা স্থানীয়ভাবে বেসরকারি উদ্যোগে বিশেষ করে টোকাইদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে রিসাইক্লিং করা হয়। আর বাদ বাকিটা রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ২০১২ সালের জুন মাসের একটি সমীক্ষাতে ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নোক্ত চিত্র পাওয়া যায়।

শক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র

| বিষয় | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন |
|---|---|---|
| বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ (টন/প্রতিদিন) | ১৯৩৮ | ২১৮৬ |
| বর্জ্য সংগ্রহের পরিমাণ (টন/প্রতিদিন) | ১৪০০ | ১১০০ |
| বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র, ২টি | মাতুয়াইল, ৪০ হেক্টর | আমিন বাজার, ২০ হেক্টর |
| বর্জ্য সংগ্রাহক গাড়ি (টি) | ২৩৫ | ১১৫ |
| বর্জ্য ধারণের কন্টেইনার (টি) | ২৭০ | ১৮০ |
| ওয়ার্ড সংখ্যা (টি) | ৫৬ | ৩৬ |
| পরিচ্ছন্নতা কর্মী (জন) | ৫৩০০ | ২৬৬১ |

বর্তমানে হয়তো বর্জ্য অপসারণ ক্ষমতা ও কর্মীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার, ঢাকায় জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণও বেড়েছে। এখনো যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনার স্তুপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। দুর্গন্ধে নাক চেপেও বাচার সুযোগ থাকে না। এছাড়া মাঝে মাঝে তরল বর্জ্যও রাস্তার ওপরে উঠে আসে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাল-ড্রেন না থাকায় ও সুয়ারেজ ব্যবস্থা নিম্নমানের হওয়ায় ঢাকা শহরের এ রকম চিত্র প্রায়শই দেখা যায়। সর্বশেষ তথ্যমতে ঢাকা শহরে খালের সংখ্যা ৫০টি হলেও এর অধিকাংশই দখল হয়ে রয়েছে ও প্রবাহ বন্ধ হয়ে আছে। ওয়াসার হিসাবে মাত্র ১২টি খালে ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রতিবেদনে ২৪টি খালের আংশিক প্রবাহ রয়েছে। বর্জ্য ও সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা দুই শীর্ষ প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা ওয়াসার মধ্যে কাজের সমন্বয় রাখার কোনো বিকল্প নেই। কেননা ড্রেনেজ সিস্টেমের প্রায় ৪০% ঢাকা ওয়াসা নিয়ন্ত্রণ করে। পরিমাণে কম হলেও বাংলাদেশের অন্যান্য বড় বড় শহরেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র প্রায় অনুরূপ।



Scanned by CamScanner

## ভবিষ্যতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর প্রভাব :

(৩৫তম বিসিএস)

বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ, যেখানে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে ৫৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৭ মি.মি. হারে বাড়ছে, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মি.মি./বছর। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ১-২ মি.মি./বছর। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর এক সমীক্ষায় বলা হয়, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি দশকে ৩.৫ থেকে ১৫ মি.মি. বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি ২১০০ সাল নাগাদ তা ৩০ সে.মি. থেকে ১০০ সে.মি.-এ পৌঁছতে পারে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

১. **বিপন্ন জনগোষ্ঠী :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো মাঝারি ধরনের প্লাবনে দেশের ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে এবং প্লাবন এলাকার পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। ফলে বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

২. **অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি :** ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট বস্তুগত সম্পদের পরিমাণ ১৮০০০ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে ২৮০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে প্লাবনের তীব্রতা বাড়বে এবং অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে।

৩. **বিপন্ন কৃষি :** IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্লাবনের কারনে দেশে আমন ধানের উৎপাদন ১৩.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন হ্রাস পাবে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দেশের কৃষি উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

৪. **নিম্নভূমিতে প্লাবন :** পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এই শতাব্দীর শেষ দিকে ২০-৬০ সে.মি. পর্যন্ত বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং নদ-নদীর পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীর উৎস দেশের বাইরে ভারত ও নেপালে। তাই একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও অপরদিকে ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট যুক্ত হয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করবে।

৫. **লোনা পানির অনুপ্রবেশ :** দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০০ সেমি বৃদ্ধি পেলে ২৫,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ লোকের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া লোনা পানি প্রবেশের ফলে চিংড়ি শিল্প ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দেশের নদ-নদীতে লোনা পানি অনুপ্রবেশ ঘটলে স্বাদু পানির মৎস্য ধ্বংস হবে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন হবে।

## উপজাতি জনগোষ্ঠী :

১৯৯১ সালের সরকারি আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ; ২০০১ সালের আদমশুমারীতে এ সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ এবং ২০১১ সালের আদমশুমারীতে ১৭ লক্ষ প্রায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ সালের জনসংখ্যা ও খানা জরীপ হিসাবে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১.১০% অর্থাৎ ১৫,৮৬,১৪১ জন উপজাতি রয়েছে। তবে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের মতে, বাংলাদেশে ৪৫টি জাতিগোষ্ঠীর ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসী জনসংখ্যা রয়েছে । আদিবাসীদের এই জনসংখ্যার প্রায় ২০ লক্ষ সমতলে এবং প্রায় ১০ লক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। এ সময়ের প্রধান প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মনিপুরি, সাঁওতাল, গারো, মুরং, তঞ্চইঙ্গ্যা এবং রাখাইন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আদিবাসী জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবন জেলায়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য বাংলাদেশের বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশে উপজাতি জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত। তবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উপজাতি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হলেও তারা এখনও দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে বাস করছে এবং নানাধরণের বৈষম্য ও মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছে।



Scanned by CamScanner

## জনসংখ্যার সোনালী ধাপ বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট :

জনসংখ্যার সোনালী ধাপ বলতে বুঝায় নির্ভরশীল জনসংখ্যার চেয়ে অধিক কর্মক্ষম জনসংখ্যা। একটি দেশের জনসংখ্যার এই বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট। এই সময়কালীন সময়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়। চারটি পর্যায়ে একটি দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় :

ক) **উচ্চ স্থূল জন্মহার এবং উচ্চ স্থূল মৃত্যুহার :** এই পর্যায়ে জনসংখ্যার স্বল্প বৃদ্ধি ঘটে বা কোন পরিবর্তন ঘটে না।

খ) **উচ্চ স্থূল জন্মহার এবং ক্রম হ্রাসমান নিম্ন স্থূল মৃত্যুহার :** এই পর্যায়ে জনসংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

গ) **হ্রাসমান স্থূল জন্মহার এবং নিম্ন স্থূল মৃত্যুহার :** এই পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থির থাকে।

ঘ) **নিম্ন স্থূল জন্মহার এবং নিম্ন উচ্চ স্থূল মৃত্যুহার :** এই পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য বা ঋণাত্মক।

বাংলাদেশ বর্তমানে উপরে বর্ণিত চারটি পর্যায়ের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে চমৎকার জনসংখ্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভোক্তা থেকে উৎপাদক শ্রেণি বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট জনসংখ্যার ৬৫ ভাগ উপার্জনক্ষম, অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী। এখন তরুণের চেয়ে বৃদ্ধের সংখ্যা কম। ২০৫০ সালে তরুণের চেয়ে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়বে।

## জনসংখ্যার সোনালী ধাপকে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ :

জনসংখ্যার সোনালী ধাপ তথা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যে সম্ভাবনা বা সুযোগগুলো সৃষ্টি করে সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারলে উপকৃত হওয়া যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই বিশেষ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন ঘটিয়েছে; আবার অনেক দেশ এই সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থও হয়েছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট থেকে সুবিধা আদায়ের জন্যে বাংলাদেশের সামনে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো হল-

ক) যথাযথ ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা;

খ) বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) নারী শিক্ষার প্রসার এবং তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা;

ঘ) বিশাল কর্মক্ষম শ্রমশক্তির ব্যবহারের ফলে বিশাল পরিমাণ শিল্প পণ্য উৎপাদিত হবে; এগুলোকে বিশ্ব বাজারে রপ্তানির জন্য নতুন বাজার নিশ্চিত করা;

ঙ) বাংলাদেশের খাদ্য সরবরাহ এবং আবাসন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট খাদ্য সরবারাহ ও আবাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তাই এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা; ও

চ) গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের চাপ বৃদ্ধিকে মোকাবেলা করা ইত্যাদি।

## ব্লু ইকোনমি :

গান্টার পাওলি 'ব্লু ইকোনমি' ধারানাটির জনক। তাঁর রচিত 'The Blue Economy 10 years - 100 innovations - 100 million jobs' বইটিতে প্রথম ব্লু ইকোনমি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আর ব্লু ইকোনমি এর প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ হল সমুদ্র অর্থনীতি। জাতিসংঘের উদ্যোগে রিও ডি জেনেরিও শহরে ২০১২ সালে ২০-২২ জুন অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন ও ধরিত্রী সম্মেলনে (Rio + 20) উঠে আসে ব্লু ইকোনমি'র ধারণা। সমুদ্র অর্থনীতির মূল উপাদান হচ্ছে মৎস্য সম্পদ ও সমুদ্রের অভ্যন্তরে বিদ্যমান তেল-গ্যাসসহ অন্যান্য অফুরন্ত খনিজ সম্পদ। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন- আমদানি-রপ্তানিতে সমুদ্র পরিবহন, সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন অর্থনীতি, বন্দর অর্থনীতি, তেল-গ্যাস-খনিজ ও সমুদ্র সম্পদের উত্তোলন, উৎপাদন এবং এগুলোর ব্যাপক বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক গতি, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ইত্যাদি হল সমুদ্র অর্থনীতির মূল উপাদান। এক কথায়, সমুদ্রের জলরাশি, সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্রকে ঘিরে গড়ে ওঠা অর্থনীতিকে বলা হয় 'ব্লু ইকোনমি' বা সমুদ্র অর্থনীতি।



Scanned by CamScanner

## সমুদ্র অর্থনীতি এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনা :

বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ডের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫শ ৭০ বর্গ কি.মি.। মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা বিরোধ নিস্পত্তির ফলে বাংলাদেশ যে বিশাল সমুদ্র এলাকার মালিকানা পেয়েছে তা মূল ভূ-খণ্ডের ৮০ শতাংশের বেশি। উপরন্তু এই বিশাল সমুদ্র এলাকায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ জৈব ও অজৈব সম্পদ। সমুদ্র এলাকার সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর ও ব্রাজিলের মত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। সমুদ্র সম্পদ বাংলাদেশের সামনে যেসব সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত করেছে সেগুলো হল :

১) সমুদ্র পরিবহন ও বন্দর অর্থনীতি চাঙ্গা করা;
২) জৈব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের সুযোগ সৃষ্টি;
৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি সংকটের সমাধান করতে পারা;
৪) তেল এবং গ্যাস উত্তোলন;
৫) মৎস সম্পদ থেকে উপার্জন;
৬) লবণ উৎপাদন ও রপ্তানি;
৭) জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের প্রসার;
৮) ধাতব ও মূল্যবান খনিজ উত্তোলন;
৯) পর্যটন অর্থনীতি বিকাশ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্ব প্রাপ্তি।

## সমুদ্র অর্থনীতির সুফল পেতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ সমূহ :

সমুদ্র অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এগুলো হল :

১) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবলের অভাব;
২) প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতা;
৩) সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা;
৪) বিশাল সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
৫) সমুদ্র এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব;
৬) অবকাঠামোগত দুর্বলতা;
৭) খনিজ সম্পদ উত্তোলনকালীন সময়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি না করা ও
৮) যথাযথ সরকারি উদ্যোগ ও নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রতা ইত্যাদি।

## মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পার্থক্য :

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলো হল-

ক) বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির আদালত ছিল ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea) যেটি জার্মানীর হামবুর্গে অবস্থিত। অন্যদিকে বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির আদালত ছিল PCA (Permanent Court of Arbitration) যেটি নেদারল্যাণ্ডের হেগ শহরে অবস্থিত।
খ) মিয়ানমারের সাথে বিরোধ নিস্পত্তি হয় ট্রাইব্যুনাল পদ্ধতিতে আর ভারতের সাথে নিস্পিত্তি হয় আরবিট্রেশন পদ্ধতিতে।
গ) সমুদ্রসীমা নির্ধারণে মিয়ানমারের দাবী ছিল ১৯৭৬ সনের প্রস্তাবিত ফ্রেণ্ডশীপ রেখার কাছাকাছি বাংলাদেশের ন্যায্য এবং মিয়ানমারের প্রস্তাবিত সমদূরত্ব পদ্ধতির সমন্বয়ে নিস্পত্তি। অন্যদিকে ভারত দক্ষিণ তালপট্টি বা নিউমুর দ্বীপকে তাদের মূল ভূ-খণ্ডের অংশ ধরে সমদূরত্ব ভিত্তিতে নিস্পত্তি করতে চেয়েছিল।



Scanned by CamScanner

## সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমুদ্র অঞ্চলের বর্ণনা :

দীর্ঘ সময় বিরোধ অব্যাহত থাকার পর আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা সমস্যার সমাধান পেয়েছে। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির মামলায় ইটলস ১৪ মার্চ ২০১২ রায় ঘোষণা করে। এর ফলে ১,১১,৬৩১ বর্গ কি.মি. সমুদ্র এলাকার ওপর বাংলাদেশের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া মায়ানমার কর্তৃক দাবিকৃত ১৭টি গ্যাস ব্লকের মধ্যে ১২ টি ব্লকের মালিকানা নিশ্চিত হয়। আর বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির রায় ঘোষিত হয় ৭ জুন ২০১৪। PCA কর্তৃক ঘোষিত রায়ে বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ ক.মি. এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ পায় ১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি.। এছাড়া অগভীর সমুদ্রে ১, ৫ এবং গভীর সমুদ্রে ৯, ১৪, ১৯, ২৪ এই ছয়টি ব্লকের কিছু অংশ বাদে ভারতের দাবিকৃত ১০টি ব্লকের সবকটির মালিকানাই পায় বাংলাদেশ। এছাড়াও এই রায়ের ফলে হড়িয়াভাঙ্গা থেকে রায়মঙ্গল নদী পর্যন্ত বাংলাদেশের জাহাজ চলাচলের বাধা দূর হয়। মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির ফলে বাংলাদেশ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সকল ধরনের প্রাণীজ ও অপ্রাণীজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার পায়।

## সমুদ্র বিজয়ের অর্জনকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য কাঙ্খিত পদক্ষেপ সমূহ :

২০১২ সালে সমুদ্র আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের (ইটলস) রায়ে মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে যে দীর্ঘ বিরোধ চলে আসছিল তার অবসান ঘটে। ৭ জুলাই ২০১৪ প্রদত্ত PCA এর রায়ের ফলে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিরাজমান সমুদ্রসীমা বিরোধ মীমাংসা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের মালিকানাধীন সমুদ্র এলাকায় মৎস, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, খনন, উত্তোলন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকল না। এখন সামুদ্রিক সম্পদের যথাযথ আহরণ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে সমুদ্র অর্থনীতির উপর কর্মকাণ্ডকে বেগবান করতে হবে। এর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন-

ক) অনুসন্ধান, উত্তোলন, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা;
খ) সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
গ) সম্পদ রক্ষায় নিরাপত্তা জোরদার করা;
ঘ) টেকসই মৎস্য সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করা;
ঙ) সমুদ্র এলাকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা;
চ) পর্যটন প্রসার করা;
ছ) বিদেশী আগ্রাসন প্রতিহত করা ও
জ) দক্ষ জনবল তৈরী করা।

## সমুদ্র বিজয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের ওপর প্রভাব :

বাংলাদেশের সমতল ভূমির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সমুদ্র অঞ্চলে তেল ও গ্যাসের মত জ্বালানী সম্পদের মজুদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান খনিজ সম্পদের মজুদ রয়েছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ ক.মি. টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খনিজ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর সমুদ্র বিজয়ে সম্ভাব্য প্রভাবগুলো হল-

ক) জিডিপি' প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি হবে;
খ) পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে;
গ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটবে;
ঘ) জ্বালানী সংকট দূরীভূত হবে;
ঙ) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে;
চ) বেকারত্ব হ্রাস পাবে;
ছ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হবে ও
জ) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে।



Scanned by CamScanner

## সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তি মামলায় সীমানা নির্ধারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মূল দাবী সমূহ এবং PCA এর সিদ্ধান্ত :

**বাংলাদেশের দাবী :** ন্যায্যতাসূত্র বা ইক্যুইটির ভিত্তিতে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগর ও ভূমির মূলবিন্দু থেকে সমুদ্রের দিকে ১৮০ ডিগ্রি সোজা রেখা থেকে সীমা নির্ধারণের দাবি জানায়।

**ভারতের দাবী :** ভারতের দাবী ছিল দক্ষিণ তালপট্টি বা নিউমুর দ্বীপকে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের অংশ ধরে সমদূরত্বসূত্র বা ইক্যুইডিসটেন্সের ভিত্তিতে সমুদ্রতট বিবেচনায় ১৬২ ডিগ্রি রেখা থেকে সীমা নির্ধারণ।

**ট্রাইব্যুনালের রায় :** ট্রাইব্যুনাল ১৭৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি রেখায় সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করে রায় প্রদান করে। একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকা ও ২০০ নটিক্যাল মাইলের ভেতরে মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সালিশি আদালত সমদূরত্ব (ইকুইডিসটেন্স) পদ্ধতিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। আদালত উল্লেখ করেছেন, বঙ্গোপসাগরের বিদ্যমান অবতলতা বিবেচনায় নিয়ে একটি 'কাট অফ ইফেক্ট' প্রয়োজন, যা শর্তাধীন সমদূরবর্তী রেখায় সমন্বয় এনে একটি ন্যাসঙ্গত ফলাফল দেবে। ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আদালত একই রকম যুক্তি দিয়েছেন।

## বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারনে PCA প্রদত্ত রায়ের উলেখযোগ্য দিকসমূহ :

বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নিয়ে দীর্ঘ ৪ বছর ৯ মাস ধরে আইনি বিতর্ক চলে স্থায়ী সালিশি আদালতে। ২০১৪ সালের ৭ জুলাই রায় ঘোষিত হয়। রায়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল-

ক) ট্রাইব্যুনাল ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গ কি.মি. সমুদ্র এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গ কি.মি. সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশকে প্রদান করেছে।

খ) হাড়িয়াভাঙ্গা নদী থেকে শুরু করে রায়মঙ্গল নদীতে বাংলাদেশী জাহাজ চলাচল করতে পারবে।

গ) ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ফলে এখন থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে বাংলাদেশের অবাধ প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত হবে।

ঘ) ভারতের দাবীকৃত ১০টি গ্যাস ব্লকই বাংলাদেশ পেয়েছে। তবে অগভীর সমুদ্রের ১, ৫ এবংগভীর সমুদ্রের ৯, ১৪, ১৯ ও ২৪ নং ব্লকের ৬,১৩৫ বর্গ কি.মি. অংশ ভারতের বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়।

ঙ) অস্তিত্ব না থাকলেও বহুল আলোচিত তালপট্টি দ্বীপ এলাকাটি এই রায়ের ফলে ভারতের মধ্যে পড়েছে।

চ) ৫০ বর্গ কি.মি. মত একটি এলাকাকে 'গ্রে এরিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রায়ে বলা হয় এই গ্রে এরিয়ার সমুদ্রপৃষ্ঠের তলদেশের সকল সম্পদের মালিকানা এককভাবে বাংলাদেশের; তবে মৎস্য আহরণে ভারতের অধিকার থাকবে।

## মৎস সম্পদের উন্নয়নে করণীয় :

মৎস সম্পদের উন্নয়নে নিম্নরূপ ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা যেতে পারে-

১) মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ/ পোনা আহরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি বাড়াতে হবে;

২) মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ নিরূপদ্রব রাখতে হবে। এজন্য আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমঝোতা প্রয়োজন;

৩) কলকারখানার বর্জ্য মুক্ত জলাশয়ে নিক্ষেপের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪) কীটনাশক ব্যবহার সীমিত করতে হবে। ফসলের পোকা-মাকড় দমনে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ (বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল) ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে;

৫) পুকুর উন্নয়ন আইন ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমানে বহুল আলোচিত নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ব্যবহার সম্পূর্ণ রোধ করতে হবে;

৬) জলমহালসমূহ ইজারা প্রদানের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জলমহালসমূহে মৎস্য অভয়াশ্রমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

৭) দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মাছের চাষে আগ্রহ বাড়াতে হবে;

৮) বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষের বিষয়ে পুকুর মালিকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে;

৯) সমন্বিত মৎস্য চাষ চালু করতে হবে;

১০) সেচখাল, নদী, বাওড়, প্লাবন ভূমি ইত্যাদিতে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ করতে হবে।



Scanned by CamScanner

## কৃষির উন্নয়নের প্রধান প্রধান বাধাসমূহ :

বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নের প্রধান বাধাগুলো হলো :

১) সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ;
২) কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ব্যর্থতা;
৩) প্রান্তিক কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও পুঁজির স্বল্পতা;
৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে আবাসনে কৃষি জমির ব্যবহার;
৫) দুর্বল অবকাঠামো ও সরকারি উদ্যোগের অভাব;
৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ও
৭) রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা।

## বাংলাদেশের বনজসম্পদের গুরুত্ব :

বাংলাদেশের বনজ সম্পদের গুরুত্ব নিম্নরূপ-

ক) একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment) ও প্রতিবেশ (Ecology) সংরক্ষণে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ন্যূনপক্ষে ঐ দেশের মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, বন্যা,অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ও বায়ুশোধন প্রক্রিয়ায় বন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
খ) "শব্দদূষণ" স্তিমিত করতে বনবৃক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।
গ) ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবং পানিসম্পদ উন্নয়নে বনের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।
ঘ) আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে বনজসম্পদের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে।
ঙ) এছাড়াও বনজসম্পদ কাঠভিত্তিক শিল্প যেমন, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, ম্যাচ ইত্যাদির প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
চ) পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বনসম্পদের প্রয়োজন অনিবার্য।
ছ) বনভূমি থেকে সংগৃহীত বাঁশ, বেত, মধু, মোম, জীবজন্তু, জীবজন্তুর চামড়া, শিং, দাঁত, ভেজষ দ্রব্যাদি ইত্যাদি একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় অন্যদিকে এগুলোর অনেক কিছু রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।
জ) দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ক্ষেত্রে বনসম্পদের অবদান প্রায় ১.৭৯ শতাংশ।

## বন উজাড়ের কারণ :

পৃথিবীর সবচেয়ে জন অধ্যুষিত দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং পরবর্তীতে বনের এই নিধনযজ্ঞ, বিশেষত গ্রামীণ বন উজাড় বেড়েছে আরো দ্রুতগতিতে। এই ভয়াবহ বন উজাড়ের কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা;
২) দারিদ্র্য;
৩) ভূমিহীন জনসাধারণের বনাঞ্চলে আবাসন;
৪) পরিবর্তিত চাষাবাদ ও জুমচাষ (পার্বত্য জেলাসমূহে);
৫) পশু খাদ্য (Grazing) ও আগুন;
৬) বনজ সম্পদের চুরি ও অননুমোদিত নিধনযজ্ঞ;
৭) জ্বালানী সংগ্রহ;
৮) অনিয়ন্ত্রিত ও ধ্বংসাত্মক নগরায়ণ প্রক্রিয়া;
৯) রাস্তাঘাট, বাঁধ, মিল-কারখানা, খনিজ উত্তোলন কর্মসূচি;
১০) হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশাল বনাঞ্চলের ধ্বংস সাধন;
১১) রিফিউজিদের পুনর্বাসন।



Scanned by CamScanner

## সামাজিক বনায়ন :

বনসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সবচেয়ে যুগোপযোগী পদ্ধতি হলো সামাজিক বনায়ন। এতে স্থানীয় জনগণ বন উজাড়কে প্রতিরোধ করে এবং একই সাথে বনোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কর্মসূচী হাতে নেয়। সামাজিক বনায়নের সার্থক উদাহরন হলো 'বেতাগী সোস্যাল প্রজেক্ট' যা ছিল 'স্বনির্ভর' বাংলাদেশের একটি কর্মসূচি। এর সফলতার মূল কারণ অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন পদ্ধতিসমূহ যেমন- ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিক; ভূমির উপর নির্ভরশীলতা এবং যারা অন্য কোথাও শ্রম বিক্রয় করবে না।

## বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের অবস্থান :

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রায় ২৮টি আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন ও প্রটোকলে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। তন্মধ্যে কয়েকটি হল-

ক) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন।
খ) এজেন্ডা ২১।
গ) কনভেনশন কনসারনিং দি প্রটেকশন অব দি ওয়ার্ল্ড কালচ্যারাল এন্ড ন্যাচরাল হেরিটেজ।
ঘ) বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের বিপদগ্রস্ত প্রজাতিভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কনভেনশন (সিআইটিইএস)।
ঙ) জীববৈচিত্র সংক্রান্ত কনভেনশন।
চ) জলাভূমি সংক্রান্ত রামসার কনভেনশন।
ছ) কনভেনশন টু কমব্যাট ডেজার্টিফিকেশন।
জ) সমুদ্রদূষণ কনভেনশন (মারপোল)।
ঝ) গ্লোবাল টাইগার ফোরাম।

## বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ :

ভৌগোলিক অবস্থান, বনজ সম্পদের পরিমাণ, মাটির প্রকৃতি, আবহাওয়ার তাপমাত্রা, আর্থসামাজিক অবস্থান, জনসংখ্যা শিক্ষার হার, শিল্পায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নের মাত্রা ইত্যাদির উপর বাংলাদেশের পরিবেশ নির্ভরশীল। বর্তমানে নিম্নবর্ণিত কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে-

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে খরা ও বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, পৌর এলাকার অপরিশোধিত বর্জ্য পানি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, তৈল বাহিত দূষণ এবং নন্দীবন্দর ও উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রবন্দর ও জাহাজভাঙ্গা কর্মকাণ্ড থেকে নিসৃত তৈল জাতীয় পদার্থ দ্বারা দেশের ভূ-উপরিস্থ পানি ক্রমাগত দূষিত হয়ে চলছে। বাংলাদেশে বর্তমানে, বিশেষ করে চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালীসহ অন্যান্য জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি একটি মারাত্মক জাতীয় সমস্যা। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্তের অপর পার থেকে প্রবাহিত ৫৭টি নদী রয়েছে। এই ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টির ক্ষেত্রে ভারত ও ৩টির ক্ষেত্রে মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ যৌথ অংশীদার। এসব নদীর উজানে সেচ ও অন্যান্য প্রয়োজনে পানি উত্তোলনের কারণে আন্তর্জাতিক সীমারেখার অপর পার হতে আগত নদীসমূহ থেকে পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ এক্ষেত্রে একটি আলোচিত উদাহরণ। গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের ফলে বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে খরা পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীজুড়ে মানবসৃষ্ট যে সকল পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে চলেছে, বায়ুদূষণ সেগুলির একটি। বাংলাদেশে বায়ুদূষণের উৎস দু'টিঃ যানবাহন ও শিল্প কারখানা থেকে নিসৃত কালো ধোঁয়া। এ দু'টি উৎস মূলত নগরাঞ্চলে বেশী মাত্রায় বিরাজমান। বায়ু দূষণের অপর উৎস হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে মূলত শুষ্ক ঋতুতে পরিচালিত অসংখ্য ইটের ভাটাও রয়েছে। বায়ুতে যানবাহন থেকে নিসৃত লেড এর উচ্চমাত্রায় উপস্থিতি নগর ও শহরাঞ্চলে একটি মারাত্মক সমস্যা। এগুলো মানব স্বাস্থ্য বিশেষ করে শিশু স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক। মানবসৃষ্ট বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা ভূমি, বনাঞ্চল ও জলজ বসতি ধ্বংস ও অবক্ষয়জনিত কারণে জীববৈচিত্র নিঃশেষিত হচ্ছে। এ সকল কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে কৃষি ব্যবস্থা, বনাঞ্চল, মৎস্য সম্পদ, নগরায়ন, শিল্প কারখানা, পরিবহন ব্যবস্থা, পর্যটন, জ্বালানি, রাসায়নিক, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সেক্টরসমূহে। অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।



Scanned by CamScanner

## পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় :

পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয়গুলো হল-

১) জাতীয় পরিবেশ নীতির সফল বাস্তবায়ন;
২) অবকাঠামো বিনির্মাণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে প্রাকনিরুপণ;
৩) পরিবেশ অধিদপ্তরকে ক্ষমতায়িতকরণ;
৪) আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন;
৫) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ;
৬) শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণ;
৭) পরিবেশ সংরক্ষণে রাজনৈতিক অংগীকার;
৮) পরিকল্পিত নগরায়ন;
৯) নির্দিষ্ট শিল্প এলাকা নির্ধারণ;
১০) কাঠের বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার;
১১) ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ;
১২) ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপন ও সংরক্ষণ;
১৩) উপকূলীয় বনরাজির সম্প্রসারণ;
১৪) বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা;
১৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
১৬) সমুদ্রে বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধকরণ;
১৭) শিল্প কারখানায় পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ;
১৮) পরিবেশ সংরক্ষণে প্রচার সম্প্রসারণ;
১৯) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধন;
২০) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানদান;
২১) পরিবেশ সম্পর্কে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা;
২২) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG) :

গ্যাস একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আধুনিক সভ্যতায় এর রয়েছে বহুমুখী ব্যবহার। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার উৎপাদন, শিল্পে ব্যবহার, জ্বালানি ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে গ্যাস একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমখী ব্যবহার করা গেলে এ দেশেও তা ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব খাতে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে এখনো আমরা কাজে লাগাতে পারি। সেটি হলো পরিবহনের জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার। এ দেশে যানবাহনে প্রাকৃতিক গ্যাস বা সিএনজির ব্যবহার ব্যাপক লাভজনক হতে পারে। কেননা পেট্রোল বা ডিজেলচালিত যানবাহনের তুলনায় গ্যাসচালিত যান থেকে দূষণ নির্গমনের মাত্রা অনেক কম। তাই সিএনজির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে পরিবেশ রক্ষায় তা হবে একটি অন্যতম মাইলফলক।

## পেট্রোলের পরিবর্তে যানবাহনে সিএনজি (CNG) ব্যহারের সুবিধা :

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ রোধ ও জ্বালানি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে যানবাহনে রূপান্তরিত প্রাকৃতি গ্যাস ব্যবহার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যানবাহনে সিএনজির ব্যবহার একদিকে পরিবেশ দূষণ রোধে যেমন সহায়তা করবে অন্যদিকে জ্বালানি তেলের ব্যয় সাশ্রয়েও সহায়তা করবে। প্রথমত, সাম্প্রতিককালে রাজধানী ঢাকা মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন নানবিধ যানবাহন থেকে নির্গত বিষাক্ত কালো ধোঁয়ায় বায়ুমন্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে কার্বন মনো অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, লিড কম্পাউন্ড, আনবার্ন হাইড্রোকার্বন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে এসব দেহে প্রবেশ করে আক্রান্ত করছে মানুষকে। আর পেট্রোল-ডিজেল চালিত যানবাহনই মূলত এসবের জন্য দায়ী। অথচ এসব যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে যে প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে তা রপ্তানির পদক্ষেপ বাদ দিয়ে তাকে সিএনজিতে রূপান্তরিত করে পেট্রোল ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করলে বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। সুতরাং, যানবাহনে পেট্রোলের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহার পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক উভয় বিবেচনায়ই যুক্তিযুক্ত।



Scanned by CamScanner

## ম্যানগ্রোভ বন :

লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ বলে। আর যে বনে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের গাছ জন্মে সে বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। ম্যানগ্রোভ বন বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূলে জন্মায়। শান্ত সাগর, খাড়ি ও নদীর মোহনাও উপযুক্ত স্থান। ম্যানগ্রোভ বনে গাছপালা-লতাগুল্ম লবণাক্ত সাগরের তীরে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে এবং গাছপালা-লতাগুল্মের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গাছের বীজ থেকে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা মূল গজায়। জলে বা ডাঙায় বীজ পড়েই মূলকে ওপর দিকে রাখে। কাদা বা মাটি পেলে মূল বীজের সহায়তায় জীবন্ত প্রাণীর মতো তা আঁকড়ে ধরে। মূল কাজ করে শ্বাসমূল হিসেবে। স্রোতে বালুকণা ভেসে যাবার সময় শ্বাসমূল বালু ও পলি জমা করে। ম্যানগ্রোভ এভাবে ভূখণ্ড তৈরি করে। গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু শিকড় মাটির তলায়, কিছু ওপর দিকে থাকে। একে বলে 'শূল'। এটি খুব ধারালো। বিশ্বের সেরা প্রজাতির গাছপালাসমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলকে বলা হয় লাল ম্যানগ্রোভ। এ বন রয়েছে ফ্লোরিডা থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলে। এ বনে গুল্ম ও ফার্ণ জাতীয় ছোট গাছ জন্মে। কিছু প্রজাতির গাছ ২৫ মিটার লম্বা হয়। গাছের বাকলে ট্যানিক এসিড থাকে। এটি চামড়া টান করতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।

## পানি দূষণ ও পানির দুষ্প্রাপ্যতা রোধে জাতীয় পানি নীতির বৈশিষ্ট্য :

পানি দুষণ ও পানির দুষ্প্রাপ্যতাজনিত সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্মরত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহ পানি দূষণ ও পানির দুষ্প্রাপ্যতা সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই নীতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য -

১) পানি সম্পদের সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বৃদ্ধিসাধন;
২) কৃষির রাসায়নিক ও শিল্পবর্জ্য পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা সুসংহতকরণসহ পানির গুণগতমান সংরক্ষণ;
৩) সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান;
৪) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত প্রক্রিয়ার জন্য পানি সেক্টরের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ।

## ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প এবং বাংলাদেশে তার সম্ভাব্য প্রভাব :

সর্বগ্রাসী এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভারত থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদীর প্রবাহ কেবল বিঘ্নিতই হবে না বরং শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশ গঙ্গার প্রায় পুরোটা এবং ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ পানি প্রবাহ থেকে চিরকারের জন্য বঞ্চিত হবে। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের অন্তত অর্ধেক অঞ্চল সামুদ্রিক লবণাক্ততার শিকার হবে। যার ফলে ফসল উৎপাদন অর্ধেক কমে যাবে, বনাঞ্চল ধ্বংস হবে, কৃষি জমিতে সেচের পানি থাকবে না এবং আমাদের স্বপ্নের যমুনা সেতুর তলদেশ শুকিয়ে যাবে। মোট কথা পুরো বাংলাদেশের চেহারাই পাল্টে যাবে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় পরিবেশবাদীসহ কিছু শুভবুদ্ধির মানুষও এর বিরোধিতায় নেমেছে। এজন্য বাংলাদেশকেও এর বিরুদ্ধে বহুমুখী প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে হবে।

## রাজধানী ঢাকাকে বন্যামুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ :

ঢাকাকে বন্যামুক্ত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-
ক) নিচু জলাশয় দখল করে ভরাট রোধ করতে হবে।
খ) আশেপাশের দখল হয়ে যাওয়া জলাশয়গুলো দখলমুক্ত করতে হবে।
গ) শহর থেকে পানি বের হয়ে যাবার জন্য আধুনিক নিস্কাশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
ঘ) ঢাকা শহর রক্ষা বাঁধের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
ঙ) বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকা দখলমুক্ত করে নদীর তলদেশের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজিং করতে হবে।



Scanned by CamScanner

## আর্সেনিক সমস্যার প্রতিকারের উপায় :

আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপের নিকটবর্তী অনেক নলকূপ আর্সেনিক দূষণ মুক্ত। এই ধরনের জটিলতার কারণে আর্সেনিক দূষণযুক্ত এলাকায় সব নলকূপের পরীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং আর্সেনিকের মাত্রার পরিমাণ অনুযায়ী বিকল্প পানির উৎসের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এক দিকে সমস্যা যেমন জটিল ও ব্যাপক, তেমনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরীক্ষণ কিটের অভাবে ব্যাপক পরীক্ষার সুযোগও সীমিত। সে কারণে আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে এক উপজেলা থেকে অপর উপজেলায় সম্পন্ন করা হবে। আর্সেনিক দূষণ এলাকায় বিভিন্ন বিকল্প প্রযুক্তি কাজে লাগানো হয়েছে। তবে প্রযুক্তিগুলো এলাকা ভিত্তিক লাগসই হতে হবে। আর্সেনিক সমস্যা সমাধানের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছে, যেমন –

১) নলকূপের পানি পরীক্ষা ও রং (চিহ্ন) লাগানো;
২) আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
৩) আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্তকরণ;
৪) বিকল্প পানির উৎস পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান ও
৫) বিকল্প পানির উৎস কার্যকর করা।

## দেশের প্রধান নদীসমূহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে করণীয় পদক্ষেপ :

আমাদের প্রধান নদ-নদীসমূহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা উচিত-

১) প্রধান নদী ও শাখা নদীগুলোর মুখ খনন করা, যাতে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিস্কাশিত হতে পারে।
২) নদীর তীর বরাবর উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ করা, যাতে পানি নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
৩) নদীর তলদেশ খনন করা, যাতে পানি বেশি পরিমাণে ও দ্রুত সাগরে চলে যেতে পারে।
৪) নদী ছোট বড় যাই হোক না কেন, নদীর মুখ বন্ধ না করেই রাস্তাঘাট ও সেতুর নির্মাণ করা।
৫) নদীর উৎস স্থলে ও অববাহিকায় ব্যাপক ঘন অরণ্য সৃষ্টি করে বৃষ্টির বা বরফ গলা পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।

## বাংলাদেশে নদীর তলদেশ পলিতে ভরাট হওয়ায় উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানের পথ :

বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় সব মিলে ২৩০টি নদ-নদী রয়েছে। এর মধ্যে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র উল্লেখযোগ্য। এক সময় এসব নদী নাব্য ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে নদীগুলোর তলদেশ পলিতে ভরে গেছে। এর ফলে নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা অনেক কমে গেছে। যার কারণে অধিক বৃষ্টিপাত ও বন্যা হলেই নদীর দুকূল প্লাবিত হয়ে পড়ে। এতে করে ফসল ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে বন্যা এখন একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতি বছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা হয়ে থাকে।

নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় শীত মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি না পাওয়ায় সেচের ব্যাঘাত ঘটে। নদীতে যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহনে সমস্যা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ড্রেজারের মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে সরকার এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এ সমস্যার আশু সমাধান করতে না পারলে দেশের কৃষিব্যবস্থা অচিরেই ভেঙে পড়বে। নৌপথে মালামাল পরিবহনও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

## বাংলাদেশের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া ভৌগলিক রেখা এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর গুরুত্ব :

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক রেখাটি অতিক্রম করেছে তার নাম কর্কটক্রান্তি রেখা। দেশের মাঝামাঝি দিয়ে এ রেখা অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। তাছাড়া মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত। এর ফলে বাংলাদেশে পরিমিত বৃষ্টিপাত হয়।



Scanned by CamScanner

## বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখা ও অবস্থান :

পৃথিবীর মানচিত্রে উত্তর অক্ষাংশের ২০° ৩৪ থেকে ২৬° ৩৮ এবং পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার ৮৮° ০১ থেকে ৯২°৪১ মধ্যবর্তী স্থানে বাংলাদেশ অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার যা ছিটমহল বিনিময়ে বর্তমানে ১৪৭৬১০ বর্গ কি.মি.-এ দাড়িয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে এ দেশটির অবস্থান।

**সীমানা ঃ** বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘলায় ও আসাম; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মিয়ানমার; পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মোট সীমানা দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কিমি। এর মধ্যে ভারত সংলগ্ন স্থল ও নৌ সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সঙ্গে রয়েছে-২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। অন্যদিকে মোট জলসীমার পরিমাণ ৭১১ কিলোমিটার। সেই সাথে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দেশ হওয়ায় এ দেশের ভূ-খন্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশটির উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ দূরত্ব ৭৬৫ কিমি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪৬৭ কিমি।

## বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি :

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী পশ্চিম, উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে এ সুবিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। সীমিত উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ণ বৈচিত্র্যহীন সমভূমি। এ দেশের ভূ-খন্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। ভূমির বন্ধুরতার পার্থক্য ও গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক থেকে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ;
২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি ও
৩। সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি।

## বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের রাজ্য :

ভারত বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের ৫টি রাজ্য রয়েছে। এগুলো হলো- পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।

**প্রাচীন বাংলার সীমানা :**

| | |
|---|---|
| উত্তরে | – হিমালয় পর্বত, নেপাল, ভূটান ও সিকিমরাজ্য। |
| দক্ষিণে | – বঙ্গোপসাগর। |
| পূর্বে | – জৈন্তাপাহাড়, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী। |
| পশ্চিমে | – সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যভূমি। |
| উত্তর-পূর্ব দিকে | – ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা। |
| উত্তর-পশ্চিমে | – বিহারের দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর উত্তরে সমান্তরাল এলাকা। |

## চাকমা উপজাতি ও মগ উপজাতি :

বাংলাদেশে পার্বত্য জেলাসমূহ যথা– রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলাতে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা সর্বাধিক। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় মগরা বসবাস করে থাকে। এদের বর্তমান সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। পটুয়াখালীর মগরা ১৭৮৯ সালে আরাকান থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল বসবাস করতে আসে।



Scanned by CamScanner

## মুরং উপজাতি ও টিপরা উপজাতি :

বান্দরবান জেলায় মুরংরা বসবাস করে থাকে। তারা পূর্বে আরাকানের অধিবাসী ছিল। খুমিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা বর্তমান আবাসস্থলে অবস্থান গ্রহণ করে। এদের বর্তমান সংখ্যা ৩ হাজার মাত্র। ষোড়শ শতাব্দীর পরে পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে টিপরারা বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলাতে চলে আসে। এরা এ তিনটি জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে রামগড় উপজেলাতেই তাদের বসবাস সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে টিপরাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার।

## বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে পরিণত করার উপায় :

বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে পরিণত করতে হলে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করতে হবে-

১। শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে;
২। স্বাস্থ্য সূচকের উন্নয়ন ঘটাতে হবে;
৩। কর্মমূখী শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;
৪। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ করতে হবে;
৫। জনসম্পদ রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হবে;
৬। প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
৭। দক্ষ ও যোগ্য জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে।

## জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সফল করার উপায় :

সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনার জন্য জনসংখ্যা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে গঠিত সমন্বয় কমিটি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য পয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪২.১ জনই অশিক্ষিত। তাছাড়া, পল্লী অঞ্চলের লোক নানা প্রকার সংস্কার ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের বুঝাতে হবে যে, নিজেদের মঙ্গলের জন্যই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদি তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে তাহলে তারা নিজেরাই এই কর্মসূচী গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে। অন্যথায়, পল্লী অঞ্চলের জনগণ এতে কোন উৎসাহই বোধ করবে না। এ কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীর এমনভাবে ব্যাখ্যা দিতে হবে যাতে গ্রামের সক্ষম দম্পতি, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেই সমানভাবে বুঝতে পেরে তা গ্রহণ করবার জন্যে উদ্যোগী হয়। এই সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপকরণ যাতে সহজলভ্য হয় এবং ঘরে ঘরে পৌঁছানো যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া প্রতিটি সক্ষম দম্পতির উপলব্ধি ও সম্মতির উপর প্রকৃতপক্ষ নির্ভর করছে। সে হিসেবে পরিবার কল্যাণ কর্মীদের কাজের সাফল্যের উপর পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভর করছে।

## জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারী সমাজের ভূমিকা :

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের চেয়েও ভয়বহতা নিয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন আজ জনসংখ্যার চাপে পিষ্ট। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা আজ আমাদের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই এ ভয়াবহ সমস্যা মোকাবেলায় যদি প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর কোন ভূমিকা না থাকে তাহলে সমস্যার সমাধান কঠিন হয়ে পড়বে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমাদের নারী সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারী সমাজ নিম্নলিখিত উপায়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে-

ক) নিজেদের অধিক সন্তান ধারণ থেকে বিরত রাখা;
খ) চিত্তবিনোদনের বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যম তৈরী করা;
গ) পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও
ঘ) পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রচার করার দায়িত্ব নেয়া। কারণ আমাদের সমাজে এখনও কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর কারণে পুরুষ মাঠকর্মীর চেয়ে মহিলা মাঠকর্মীরা সহজে অশিক্ষিত ও দরিদ্র মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সহজে উদ্বুদ্ধ করতে পাববে।



Scanned by CamScanner

## জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আন্দোলনে পরিণত করার উপায় :

জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠার জন্য জনসংখ্যা কার্যক্রমকে একটা সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তর করার প্রয়াজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই আন্দোলন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা প্রধানতঃ নিম্নরূপঃ

(১) জনসংখ্যা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য সমাজের সর্বস্তরের নেতৃবর্গ, সমাজকর্মী, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা;
(২) জন্ম নিরোধক ব্যবহারের প্রতি সামাজিক সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবর্গ যথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবর্গ, জনপ্রতিনিধি ও সামাজিক কর্মীদের ঘনিষ্ঠভাবে জনসংখ্যা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্তকরণ;
(৩) ছোট পরিবারকে জনপ্রিয় করে তোলা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের প্রবণতা রোধ করা, কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান যাতে অধিকতর কাম্য না হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবারই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করা;
(৪) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রতি ধর্মীয় নেতাদের সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৫) দুটি সন্তানের পরিবারের জন্য সরকারী সুবিধাদির সম্প্রসারণ এবং দুয়ের অধিক সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের জন্য সরকারী সুবিধাদি সীমিতকরণ;
(৬) পরিবার পরিকল্পনায় নিয়োজিত সফল কর্মীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা এবং
(৭) আইনের মাধ্যমে পুরুষ ও মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স এবং পরিবারের আকার নির্ধারণ করা।

## 'বাঙালীরা সঙ্কর জাতি'- এসম্পর্কে মতামত :

বর্তমান বাঙালী জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এর মূল কাঠামো সৃষ্টির কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বাঙালী জনগোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) প্রাক আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী এবং (খ) আর্য নরগোষ্ঠী। এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদেরই বসতি ছিল এবং এই প্রাক আর্য নরগোষ্ঠী বাঙালী জীবনের মেরুদন্ড। আর্যদের আগমনে জীবন উৎকর্ষমন্ডিত হয়ে ওঠে। বৈদিক যুগে আর্যদের সাথে বাংলাবাসীর কোন সম্পর্ক ছিল না। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাংলার নরনারীকে অনার্য ও অসভ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার আদিম অধিবাসী আর্যজাতি থেকে উদ্ভূত হয়নি। আর্যপূর্ব জন গোষ্ঠী মূলত নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় এই চার শাখায় বিভক্ত ছিল। নিগ্রোদের মত দেহগঠনযুক্ত এক আদিম জাতির এ দেশে বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। কালের পরিবর্তনে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত। অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালী জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের নিষাদ জাতি বলেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক গোষ্ঠী জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। এরাই কোল, ভীল, সাওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্ব পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত। বাঙালীর রক্তে এদের প্রভাব আছে; বাংলা ভাষার শব্দে ও বাঙালী জীবনের সংস্কৃতিতে এরা প্রভাব বিস্তার করেছে। অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তারা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে আর্যপূর্ব বাঙালী জনগোষ্ঠী। এদের রক্তধারা বর্তমান বাঙালী জাতির মধ্যে প্রবহমান। অষ্ট্রিক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলছিল, তার সঙ্গে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালী জাতী। এ জন্য প্রাক আর্য আদিম জাতি বাঙালী জনসাধারণের তিনচতুর্থাংশ অধিকার করে রয়েছে। বাংলা ভাষা ও গ্রামীণ জীবনে এদের স্পষ্ট প্রভাব থাকলেও বাংলাদেশে আর্য অভিযানের জনসমষ্টির সংমিশ্রণ ঘটে। তাই একথা বলা যায় যে বাঙালীরা শঙ্কর জাতি।

## বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসত্তা :

আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতিগত গোত্রের লোকজন দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। সকল সম্প্রদায় ও জাতিই নিজ নিজ মহিমা ও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এছাড়াও আমাদের দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন উপজাতি তথা ক্ষুদ্র জাতিসমূহ রয়েছে। বর্তমান পার্বত্য জেলাসমূহের প্রাকৃতিক নিসর্গে বসবাস করছে চাকমা, তঞ্চঙইঙ্যা, মগ, কুকি, লুসাই, মুরং, টিপরা, পাঙ্খো, বনযোগী ও খুমিরা। কক্সবাজারের মগ, সিলেটের মনিপুরী ও খাসিয়া, ময়মনসিংহের গারো ও হাজং, রংপুর-রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ার ওঁরাও, সাঁওতাল ও রাজবংশীদের কথাও উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে একটু দূরে বাস করলেও তারা সবাই আমাদের দেশেরই নাগরিক। তাদের সুখ-দুঃখ এবং আমাদের হাসি-বেদনার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। এ সকল জনগোষ্ঠীর অনেকে নিরক্ষর হলেও তারা অশিক্ষিত নয়। তাদের সবারই রয়েছে নিজস্ব পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং তাদের সরল জীবনযাত্রা থেকে অমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।



Scanned by CamScanner

## বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সমস্যাটি বহুমুখী হয়ে পড়েছে। তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃষ্টি, খরা ইত্যাদির প্রকোপ বাড়ে। চরম আবহাওয়ার মাত্রা বাড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘন ঘন আসে। সাগর উত্তপ্ত হওয়া, মাটি ও পানির অম্লত্ব বেড়ে যাওয়া, সংক্রমণের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়া সবকিছুই ঘটে। জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্য প্রক্রিয়ার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকেও প্রভাবিত করে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক-

১। জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ প্রতিরোধ করে উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রতিহত করা;
২। উন্নত প্রযুক্তি ও নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
৩। টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রযুক্তি অনুসরণ করা;
৪। কৃষি জমির অপব্যবহার রোধ করা;
৫। সেচ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য পানির সীমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৬। প্রযুক্তি ও কৌশল বিনিময়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা গড়ে তোলা;
৭। বন্যা ও খরা সহনীয় ফসলের জাত উদ্ভাবন করা ও
৮। বৈশ্বিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

## জলবায়ু শরণার্থী :

বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত যেসব মানুষ নিজেদের বসতবাড়িসহ সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয় তাদেরকেই জলবায়ু শরণার্থী বলা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করবে। বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে ভবিষ্যতে জলবায়ু শরনার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হারে বৃদ্ধি পাবে বলে জলবায়ু ও পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ আশংকা করছেন।

## জলবায়ু পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকীর কারণ সমূহ :

ক্রম বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় বিস্তীর্ণএলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া, ঝড়/জলোচ্ছাস বৃদ্ধি, স্থলভাগের অভ্যন্তরে লোনা পানির অনুপ্রবেশ, প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের আবাসস্থল/পরিবেশ পবির্তনের ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস ও জীব বৈচিত্রের বিলুপ্তি অন্যতম। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক অবনতির আশংকা থেকে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী যেসব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তার ফলে বিশ্ব নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আতংকিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব প্রভাব পড়ছে সেগুলো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য যে হুমকীগুলো সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো হল-

০১. দুর্বল ও ভঙ্গুর রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়বে;
০২. বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা হুমকীতে পরবে;
০৩. শিল্প ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে;
০৪. বিশ্ব অর্থনীতি হুমকীতে পড়বে;
০৫. সমস্যা তৈরিকারী এবং আক্রান্ত দেশসমূহের মাঝে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাবে;
০৬. মানবাধিকার লংঘন এবং শিল্পপ্রধান উন্নত দেশসমূহের বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনায় হুমকি বৃদ্ধি পাবে;
০৭. প্রথাগত নিরাপত্তা নীতিকে হুমকিতে ফেলবে ও
০৮. অভিবাসন বাড়বে।



Scanned by CamScanner

## বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ :

বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস ইফেক্টের জন্য সিএফসি বা কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমন্ডলের বহির্গামী তাপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রীণ হাউস গ্যাসের মধ্যে রয়েছে কার্বনডাই অক্সাইড, সিএফসি, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলঃ

০১। পৃথিবীর বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া;
০২। সূর্যালোকের ঘনত্বের তারতম্য;
০৩। সৌর তেজস্ক্রিয়তা;
০৪। অপরিকল্পিত নগরায়ন;
০৫। বৃক্ষ নিধন;
০৬। মারণাস্ত্র উৎপাদন ও এর ব্যবহার;
০৭। ব্যাপক শিল্পায়ণ;
০৮। রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার;
০৯। জ্বালানীর অপরিকল্পিত ব্যবহার ও
১০। বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার ইত্যাদি।

## বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া :

১৯৮০ থেকে ২০০৭ সন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত আইপিসিসির গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা দশমিক দুই ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে শুরু করে ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এশিয়া মহাদেশে হবার কারণে আমাদের শংকিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলো নীচে উল্লেখ করা হলঃ

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে;
২। নিম্ন উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবে।
৩। কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে মরুকরণ ঘটবে;
৪। কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবে;
৫। জীব বৈচিত্র ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস হবে;
৬। নদ-নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হয়ে যাবে;
৭। মৎস ও বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে;
৮। পানি সমস্যা দেখা দিবে ও
৯। রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে।

## বিশ্ব জলবায়ু পবির্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় :

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত হবার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পবির্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয়গুলো নীচে উল্লেখ করা হলঃ

০১) সারা দেশে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক হারে বনায়ন করতে হবে;
০২) সিএফসির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে;
০৩) ইটভাটা, শিল্পকারখানা ও যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;
০৪) জ্বালানী হিসেবে কাঠ বা জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে;
০৫) উন্নত দেশগুলোর শিল্প ও গবেষণাগারের বর্জ্য আমদানী নিষিদ্ধ করতে হবে;
০৬) বিশ্ব জলবায়ু পবির্তনের আচরণগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে;
০৭) আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
০৮) ধনী রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বাংলাদেশের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য আবেদন উত্থাপন করতে হবে ও
০৯) বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সহায়ক ক্রিয়াকর্ম থেকে জনগণকে বিরত থাকার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।



Scanned by CamScanner